দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

ভবিষ্যৎ ভারতের বাজেট

৭৮ বর্ষ, ২৪ সংখ্যা।। ৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬, ২৬ মাঘ, ১৪৩২।। যুগাব্দ - ৫১২৭ website : www.eswastika.com

কুটুম্ব প্রবোধন → লক্ষ্য

যৌথ পরিবার

সংগঠিত পরিবার

সশক্ত পরিবার

সুস্থ পরিবার

সুরক্ষিত পরিবার

সমর্থ পরিবার

সম্পন্ন পরিবার

সুসংস্কৃত পরিবার

সমৃদ্ধ পরিবার

ব্যবস্থিত পরিবার

প্রভাবশালী পরিবার

আদর্শ পরিবার

প্রতিষ্ঠিত পরিবার

সন্তুষ্ট পরিবার

সুখী পরিবার

আনন্দিত পরিবার

আপনার এলাকায় কুটুম্ব প্রবোধন গতিবিধির কেন্দ্র খুলতে চাইলে
এই নম্বরে যোগাযোগ করুন— ৯৮৩৬৪৪৫৫২২ (9836445522)

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৮ বর্ষ ২৪ সংখ্যা, ২৬ মাঘ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

৯ ফেব্রুয়ারি - ২০২৬, যুগাব্দ - ৫১২৭,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ভাবনা ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2025-2027

R N I Regd. No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত। মুদ্রক প্রশান্ত কুমার হাজরা।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

শাসক যদি আদর্শ আর মেধাহীন হয় তবে আগাছারাও গণতন্ত্র ধ্বংস করতে পারে : হারাকিরি □ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় □ ৬

রাজীবের মুখে রামনাম □ সুন্দর মৌলিক □ ৭

তুষ্টীকরণের রাজনীতি এবং তার পরিণতি ঃ এক বিশ্লেষণ □ প্রদীপ সিংহ □ ৮

ইসলামি বিশ্বের শেষ গন্তব্য—সনাতন ধর্ম □ শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী □ ১১

বিকশিত ভারতের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় অর্থ বাজেট (২০২৬-২৭) □ ড. রতন কুমার ঘোষাল □ ১৪

২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে ভারতের প্রতিরক্ষা বাজেট সামরিক বাহিনীর আধুনিকীকরণ এবং প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতা অর্জনে সহায়ক হবে □ কর্নেল (ড.) কুণাল ভট্টাচার্য □ ১৬

কেন্দ্রীয় বাজেটে শিক্ষাক্ষেত্রে বরাদ্দ একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ □ বাপি প্রামাণিক □ ১৮

যমুনা মানেই শরৎচন্দ্র, আর... □ নন্দলাল ভট্টাচার্য □ ৩১

ভারতের শাড়ি-ঐতিহ্যে বিমোহিত বিশ্ব □ কৌশিক রায় □ ৩৪

কেন্দ্রীয় বাজেট-২০২৬ : মূলধনী ব্যয় বৃদ্ধি আগামীদিনে সম্পদশালী ভারতের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করবে □ সুদীপ্ত গুহ □ ৩৬

এবারের কেন্দ্রীয় বাজেট রাজ্যের অগ্রগতির সহায়ক □ ড. পঙ্কজ কুমার রায় □ ৩৮

হিন্দু রক্তে হালাল বাংলাদেশ! □ সুভাষ চক্রবর্তী □ ৩৯

কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৬-২৭ : শক্তিশালী আত্মনির্ভর বিকশিত ভারতের কয়েকটি দৃঢ় পদক্ষেপ □ বিমলশঙ্কর নন্দ □ ৪৩

বাংলাদেশে নির্বাচনকে সামনে রেখে উদ্বিগ্ন ও শঙ্কিত হিন্দু সমাজ □ বিশেষ প্রতিনিধি □ ৪৫

ভারতীয় রাষ্ট্রীয়তার পথপ্রদর্শক ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় □ রানার চট্টরাজ □ ৪৭

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ও গণতন্ত্রের সংকট □ অরুণ কুমার চক্রবর্তী □ ৪৮

আনন্দপুর অগ্নিকাণ্ডের দায় রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধানকে নিতেই হবে □ জাহ্নবী রায় □ ৪৯

অজিত পাওয়ারের বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যু নিয়ে তৃণমূলনেত্রী অবিবেচক মন্তব্য কি বিনাশকালে বুদ্ধিনাশ? □ বিশ্বপ্রিয় দাস □ ৫০

নিয়মিত বিভাগ :

□ চিঠিপত্র : ১৯-২০ □ অঙ্গনা : ২১ □ সুস্বাস্থ্য : ২২ □ সমাবেশ সমাচার : ২৩-৩০ □ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ □

প্রকাশিত হবে
১৬ ফেব্রুয়ারি
২০২৬

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
১৬ ফেব্রুয়ারি
২০২৬

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

শিবময় ভারত

ভগবান শিবের পূজা ও উপাসনা ভারতের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবনে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে রয়েছে। দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ-সহ বিভিন্ন শিবমন্দির সমগ্র ভারতকে একসূত্রে বেঁধে রেখেছে। শিবরাত্রিতে সমগ্র ভারত মেতে ওঠে শিব আরাধনায়।

স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় শিবময় ভারত বিষয়ে আলোকপাত করবেন কয়েকজন বিশিষ্ট লেখক।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION

A/C. No. : **103502000100693**

IFSC Code : **IOBA0001035**

Bank Name :
INDIAN OVERSEAS BANK

Branch : **Sreemani Market**
Kolkata-700 006

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার বার্ষিক গ্রাহকদের প্রতি সপ্তাহে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পত্রিকা পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০/ টাকা এবং রেজিস্ট্রি খরচ ২১০০/ টাকা (মোট ২৮০০/) টাকা পাঠাতে হবে।

যে সকল গ্রাহক প্রতি মাসের পত্রিকা (৪/৫টি) একত্রে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে নিতে ইচ্ছুক তাদের গ্রাহক মূল্য ৭০০/ টাকা এবং রেজিস্ট্রি খরচ ৫৫০/ টাকা (মোট ১২৫০ টাকা) পাঠাতে হবে।

যোগাযোগ : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫ ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেক Subhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**

Bank A/c --- 103502000100693 IFSC -- IOBA0001035

Bank -- Indian Overseas Bank

Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

কেন্দ্রীয় অর্থ বাজেট— ২০২৬-২৭

২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী পদে নরেন্দ্র মোদী আসীন হইবার পর হইতে দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভিন্ন প্রকারের কেন্দ্রীয় নীতি প্রণয়নের প্রক্রিয়ার সূত্রপাত হইয়াছে। নিছক কেন্দ্রীয় আয় ও ব্যয় বিষয়ক হিসাবপত্রের মর্যাদা হইতে উন্নীত হইয়া ভারত সরকারের 'ইকোনমিক স্ট্র্যাটেজি ডকুমেন্ট' বা অর্থনৈতিক কৌশল ও সংস্কার কর্মসূচীর দলিলে উত্তীর্ণ হইয়াছে কেন্দ্রীয় অর্থ বাজেট। বিগত সরকারের ন্যায় জনমোহিনী বাজেট পেশের পরিবর্তে ২০১৪ হইতে অদ্যাবধি কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীগণ দেশের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সদর্থক, সুনির্দিষ্ট নীতিভিত্তিক বাজেট প্রণয়নে গুরুত্বদান করিয়াছেন। ২০২২ সালে স্বাধীনতার ৭৫তম বর্ষপূর্তি উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ২০৪৭ সালে 'বিকশিত ভারত' নির্মাণের সংকল্প গ্রহণ করিয়াছেন প্রধানমন্ত্রী। উল্লেখ্য, ওই সময়েই স্বাধীনতা লাভের শতবর্ষ উদ্‌যাপন করিবে দেশ। কেন্দ্রীয় নীতিতে পরিবর্তনের সুফল ইতিমধ্যেই লাভ করিতে শুরু করিয়াছে সমগ্র দেশ। দুর্নীতি দমন, প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি, ব্যবসাবাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিপুল পরিমাণ সংস্কার কর্মসূচী রূপায়ণের ফলে বর্তমানে বিশ্বের চতুর্থ অর্থনীতির শিরোপা অর্জন করিয়াছে ভারত।

আমদানি-নির্ভর অর্থনীতির পরিবর্তে দেশীয় উৎপাদন বৃদ্ধির প্রতি গুরুত্ব আরোপ-পূর্বক ভারত সরকারের পক্ষ হইতে 'মেক ইন ইন্ডিয়া' কর্মদ্যোগের কারণে বিভিন্ন রাজ্যে শিল্পোন্নয়ন ত্বরান্বিত হইয়াছে। ইহার সহিত 'ইজ অফ ডুয়িং বিজনেস' প্রকল্পে কেন্দ্রীয় গুরুত্ব আরোপিত হইবার কারণে বিভিন্ন শিল্পে আর্থিক বিনিয়োগ এবং নূতন শিল্প স্থাপনের প্রক্রিয়াও গতিলাভ করিয়াছে। বলা বাহুল্য যে, শিল্পোন্নয়নের কারণে সৃষ্টি হইতেছে কর্মসংস্থান। প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ কর-সহ কেন্দ্রীয় রাজস্ব সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার সংস্কার বাস্তবায়নের সঙ্গে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় নানা পরিবর্তন, অনলাইন আর্থিক লেন-দেনের সুব্যবস্থা ইত্যাদির মাধ্যমে দেশের মধ্যে 'কালো টাকা'-কেন্দ্রিক সমান্তরাল অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভবপর হইয়াছে। মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ-সহ রাজকোষ ঘাটতি হ্রাসে একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছে কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রক ও ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক। ২০১৪ পরবর্তী পর্যায়ে দেশ জুড়িয়া স্থায়ী সম্পদ নির্মাণে তৎপর হইয়াছে কেন্দ্র। এই লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় মূলধনী ব্যয় বহুগুণ বৃদ্ধির কারণে দেশে নদী বন্দর, সমুদ্র বন্দর, স্থল বন্দর, বিমানবন্দর, রেলপথ, সড়কপথ, জলপথ পরিবহণ, মেট্রোরেল প্রকল্প, উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান, চিকিৎসাকেন্দ্র, নদীবাঁধ, প্রতিরক্ষা পরিকাঠামো নির্মিত হইয়াছে। পুরাতন পরিকাঠামো ও প্রতিষ্ঠান-সমূহ উন্নততর ও সম্প্রসারিত হইয়াছে। প্রতিরক্ষা ও মহাকাশ গবেষণার ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে স্বনির্ভর হইয়া উঠিতেছে ভারত। নগরোন্নয়নের পাশাপাশি কৃষিক্ষেত্র ও গ্রামোন্নয়নের প্রতিও বিশেষ দৃষ্টিদান করিয়াছে কেন্দ্রীয় সরকার। কৃষকদিগকে আর্থিক সাহায্য প্রদান, কৃষিজমিতে জলসেচ ব্যবস্থা এবং গ্রামাঞ্চলে আবাস ও পথঘাট নির্মাণে গুরুত্বদানের পাশাপাশি নবরূপে গ্রামীণ রোজগার যোজনা ইতিমধ্যেই রূপায়ণ করিয়াছে কেন্দ্র। দরিদ্র, অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে দারিদ্র্যের করালগ্রাস হইতে মুক্ত করিবার লক্ষ্যে সংকল্পবদ্ধ কেন্দ্রীয় সরকার। দেশবাসীর জন্য আয়ুষ্মান ভারত চিকিৎসাবিমা, গণবণ্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে বিনামূল্যে খাদ্যসামগ্রী সরবরাহ, শহর ও গ্রামাঞ্চলে পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহ ব্যবস্থা-সহ অসংখ্য জনকল্যাণমূলক প্রকল্পে প্রতি বৎসর বিপুল পরিমাণ আর্থিক বরাদ্দ করিয়া চলিয়াছে কেন্দ্র। বিশ্বের বৃহৎ অর্থনীতিসমূহ যখন নানাভাবে আর্থিক মন্দা ও শ্লথগতির সম্মুখীন, তখন তাহার বিপ্রতীপে কৃষি, শিল্প, পরিষেবা— প্রতিটি ক্ষেত্রে ক্রমোন্নতির কারণে ভারতের আর্থিক বৃদ্ধির হার নিম্নগামী হইবার পরিবর্তে স্থিতিশীল রহিয়াছে। অর্থনৈতিক সমীক্ষা রিপোর্ট-২০২৫-২৬ অনুসারে, ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে ভারতের জিডিপি বা মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ৬.৮ থেকে ৭.২ শতাংশ হারে বৃদ্ধির সম্ভাবনা রহিয়াছে। আন্তর্জাতিক স্তরে নানা অস্থিরতা সত্ত্বেও সর্বপ্রকার প্রতিকূলতাকে জয় করিয়া বিশ্ব অর্থনীতির চালিকাশক্তি হইয়া উঠিয়াছে ভারত। অন্যান্য অর্থনীতিতে স্থবিরতা দৃশ্যমান হইলেও, শক্তিশালী রাজনৈতিক নেতৃত্ব, দৃঢ় অর্থনৈতিক ভিত্তি এবং আর্থিক ক্ষেত্রে ধারাবাহিকভাবে সংস্কারমূলক নীতি নির্ধারণের কারণে ভারতে আর্থিক বিনিয়োগ বর্তমানে ক্রমবর্ধমান। ইহারই ফলাফল হইল উপরোক্ত জিডিপি বৃদ্ধির হার। ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষ হইতে কার্যকর হইতেছে আয়কর আইন, ২০২৫। উচ্চমূল্যের বিভিন্ন জীবনদায়ী ঔষধ প্রস্তুতিকল্পে 'বায়োফার্মা শক্তি' প্রকল্পের সূত্রপাত-সহ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশেষ তহবিল গঠন করিয়াছে কেন্দ্র। 'ভারত বিস্তার' নামক পোর্টাল নির্মাণের মাধ্যমে চলিবে ভারতীয় কৃষিপদ্ধতির প্রচার-প্রসার।

সুভাষিতম্

মাতৃবৎ পরদারেষু পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ।
আত্মবৎ সর্বভূতেষু যঃ পশ্যতি সঃ পণ্ডিতঃ।।

পরস্ত্রীকে মায়ের মতো, পরের জিনিসকে মাটির ঢেলার মতো এবং সমস্ত প্রাণীকে যিনি নিজের মতো দেখেন, তাঁকে পণ্ডিত বলা হয়।

শাসক যদি আদর্শ আর মেধাহীন হয় তবে আগাছারাও গণতন্ত্র ধ্বংস করতে পারে

হারাকিরি

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

রাজনৈতিক বিদ্বানদের দাবি রাজনীতিতে আদর্শের মৃত্যু ঘটেছে। অর্থাৎ 'অবনিউবিলেশন' আর 'অসিফিকেশন' হয়েছে। রাজনৈতিক মতাদর্শহীনতা, মতাদর্শগত ধোঁয়াশার কারণে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও দলীয় নেতৃত্ব যেন ফসিলে পরিণত হয়েছে। ১৫ বছর ধরে বোকামির ধোঁয়ায় এই রাজ্যের রাজনীতি ঢাকা। তৈরি হয়েছে কিছু কিছু ধোঁয়া নেতা। তলিয়ে না ভেবে বলা যায় দাবিটা মিথ্যা নয়। কিছুদিনের ভিতরেই ৪-৫ জন ধোঁয়া নেতা গ্রেপ্তার হতে পারেন বলে কানাঘুসো শোনা যাচ্ছে। এই আবহে ঘটে গিয়েছে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূলনেত্রীর দিল্লি সফর। সুপ্রিম আদালতের শিরে সংক্রান্তি নিয়েই দিল্লি গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। গত ২ ফেব্রুয়ারি দিল্লিতে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন তিনি। পরের দিন ইডির আবেদনের ভিত্তিতে সুপ্রিম আদালতে শুনানি। স্তাবক ঘেরা একটি পারিবারিক দল ২০১১-র পর থেকে ১৫ বছর ধরে ফাঁকতালে এ রাজ্যে ক্ষমতায় রয়েছে। হরিণ লাঙ্গল টানতে পারে না আর ছাগল যব মাড়াতে। ২০২১ সাল থেকে তৃণমূলএকটি আষাঢ়ে গল্প আর মিথ্যা চালু করেছে যে, পশ্চিমবঙ্গ হলো ভারতের বাইরে আলাদা একটি রাজ্য। সেখানে কেবল বাঙ্গালি বলে একটি জাতি থাকে যারা ভারতীয় নয়। ভারতের অন্য রাজ্যের মানুষকে তারা 'বহিরাগত' বলে। এই গুল্পকে মদত দিতে কিছু আগাছাও তৈরি হয়েছে। সে মূর্খেরা বাঙ্গালিদের সাক্ষাৎ ভুয়ো ইজারা নিয়েছে।

এ রাজ্যের বিজেপির নেতৃত্ব তৃণমূলিদের ভাষায় বহিরাগত। তৃণমূলনেত্রী-পুষ্ট মূর্খেরা বোঝে না কেন এ রাজ্যে বিজেপি প্রায় ৪০ শতাংশ ভোট পায়। সীমাহীন কুকীর্তি ঢাকতে এই তস্করি কায়দা। এক নিকৃষ্ট স্তাবক আমলা বাঙ্গালির মনস্তত্ত্ব নিয়ে বই লিখেছেন। এই প্রতিবেদকের জানা নেই যে, তিনি সামাজিক মনস্তত্ত্ব আর বাঙ্গালি জাতির বিষয়ে কবে গবেষণা করেছিলেন। বিদেশি বামেদের জমানা থেকেই তিনি শিরদাঁড়া বেচে খাওয়া রপ্ত করেন। যেমন তার ভায়রাভাই। বইটি পড়লে মনে হবে বাঙ্গালিরা ভারতীয় নন। আলাদা একটি জাতি। মুখ্যমন্ত্রী (উহ্য) ছাড়া তা কেউ জানে না। আদেখলাপনা করার জন্য আদালত বিশ্ববিদ্যালয়ে তার স্ত্রীর সর্বোচ্চ পদ খারিজ করে। তস্করীতে অভিযুক্ত কোনো শাসককে রাজ্যের ৪৫ শতাংশ ভোটার কী করে ক্ষমতায় রাখতে পারে সেটাই আশ্চর্যের! ২০২১ থেকে তৃণমূল রেউড়ি রাজনীতি শুরু করে। 'শ্রী', 'সাথী' আর 'ভাণ্ডার' চালু করে ভোট কেনে। ২০১৩-১৪ সালে সারদা, রোজ ভ্যালি-সহ অসংখ্য চিটফান্ড সংস্থার মাধ্যমে তৃণমূল যে পুকুর চুরি করে এবং তৃণমূলের শীর্ষ নেতারা যে নারদা কেলেঙ্কারি সংঘটিত করে, ২০১৬-র রাজ্য বিধানসভা ভোটে তার প্রভাব পড়েনি। ২০২১-এ সে ধাক্কা পড়তে পারে ধরে নিয়েই নজর ঘোরানোর জন্য রেউড়ি চালু করা হয়।

দীর্ঘদিন ধরেই পশ্চিমবঙ্গ শিল্প শ্মশানে পরিণত হয়েছে। তার ওপর দান-খয়রাতির দৌলতে রাজ্য এখন দেউলিয়া। ২০১৪ ও ২০১৯-এ নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন বিজেপি দেশজুড়ে একক জয় পায়। প্রায় একই সময় এই রাজ্যে বিজেপির বিপুল উত্থান ঘটে। তা সামলানোর ক্ষমতা রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের ছিল না। তাই রাজনৈতিক পরামর্শদাতার কথায় দুরাত্মার বেশে সরাসরি ভোট কেনা আর কয়েক ধরনের ভাতা, ভিক্ষা চালু করতে হয়। স্বাধীনতার পর থেকে প্রায় ২৬ বছর ধরে ভুলিয়ে আর গুলিয়ে দেওয়ার রাজনীতি করে কংগ্রেস। বিদেশি বামেরা তাতে যুক্ত করে অত্যাচার আর রক্তের হোলি। রাজনৈতিক কায়দায় তারা তৃণমূলনেত্রীকে ব্যবহার করে। রাজনৈতিক আন্দোলনের মাধ্যমে এক প্রকার অরাজক পরিস্থিতি তিনি তৈরি করলেও তার বিরুদ্ধে কোনো কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। এ রাজ্যে বিজেপি আর কংগ্রেসকে চাপে রাখতে তা করা হয়। তৃণমূল তৈরি হওয়ার সময় বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোট সরকার দিল্লিতে ক্ষমতায় আসে। সিপিএম জানত যে, তৃণমূলনেত্রীকে সরালে বিজেপিকে আটকানো অসম্ভব। তাই রাজ্যে বিজেপির উত্থান রুখতে তাকে ছাড়া গোরু করে রেখেছিল। এনডিএ জোটে আসীন হলেও বহুবার বিজেপিকে সাবোতাজ করেন তৃণমূলনেত্রী। বিজেপি জানত রাজনৈতিকভাবে তৃণমূলনেত্রী কংগ্রেসের উচ্ছিষ্ট। বিদেশিদের কাউন্টার করতে তখন তৃণমূলনেত্রী ছিলেন একপ্রকার বিকল্প। রাজনৈতিক মধ্যস্থতাকারী ছাড়া সে সময় তৃণমূলনেত্রীর কোনো ভূমিকা ছিল না। তিনি যখন মুখ্যমন্ত্রী হন, তখন এই রাজ্যের সর্বনাশ লেখা হয়ে যায়। ২০১১-য় সিপিএম-বিরোধী ভোট পড়েছিল রাজ্যে পরিবর্তনের লক্ষ্যে। তৃণমূলনেত্রীর মুখ দেখে নয়। ২০২১ সালের ভোটে তৃণমূলনেত্রীর মুখ সামনে নিয়ে আসে আইপ্যাক। তবে শেষরক্ষা হয়নি। 'বাংলার মেয়ে', মুখ্যমন্ত্রীর মুখ তৃণমূলনেত্রী প্রথম দফায় বিজেপির শুভেন্দু অধিকারীর কাছে হেরে যান। নন্দীগ্রাম থেকে পালিয়ে ভবানীপুরে জেতেন। একবার সিপিএম (১৯৮৯) আর একবার বিজেপির কাছে হারেন তৃণমূলনেত্রী। ২০২১-এ প্রথমবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় প্রধান বিরোধী দলের মর্যাদা পায় বিজেপি। ২০২৬-এ তাদের ভাগ্যে শাসকের মুকুট জুটতেই পারে। উনিশ শতকের আগে পর্যন্ত জাপানে 'হারাকিরি'র মতো সম্মানের স্বেচ্ছামৃত্যুর প্রথা চালু ছিল। অপমান বা পরাজয় এড়াতে কিংবা ব্যর্থতার দায় নিয়ে কেউ নিজের পেট কেটে স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করত। পরে তা নিষিদ্ধ হয়। তৃণমূলের জন্য সে রাজনৈতিক হারাকিরির সময় আগত কি না দু'মাস বাদেই তা জানা যাবে।

(লেখকের মতামত ব্যক্তিগত)

রাজীবের মুখে রামনাম

ক্ষমতাময়ীষু দিদি,

অবসর গ্রহণের আগে রাজীব কুমার এমন অনেক কথা বললেন যাতে মনে হতে পারে ভূতের মুখে রামনাম। কিন্তু দিদি, এখন রামনামে লাভ হবে কি? তাঁর গায়ে যে কালি লেগে!

আমি জানি দিদি, অবসর মানে বিদায়বেলা। একটা ভাবগম্ভীর পরিবেশ। তখন বিবেক জেগে ওঠে। রাজীব কুমারেরও বিবেক জেগে উঠেছিল বোধ হয়। গোটা জীবন অধর্মের পথে চলা মানুষেরও যখন শেষকালে বিবেক জেগে ওঠে, তখন একটা প্রবাদ বলা হয়— 'মরণকালে হরিনাম।' না না, আমি রাজীবদাদা সম্পর্কে এটা বলছি না মোটেও!

আলিপুর বডিগার্ড লাইনে নিজের ফেয়ারওয়েল প্যারেডে রাজীব কুমার পুলিশের কর্তব্য কী, কী স্মরণে রাখা উচিত, পুলিশের কাছ থেকে সমাজ কী প্রত্যাশা করে, তা সুন্দর কথায় বলেছেন তিনি। শুনতে শুনতে আমার মনে হয়েছিল, কাজের সময়ে তিনি মানুষের প্রত্যাশা পূরণের জন্য নিরপেক্ষতা দেখিয়েছিলেন কি? মনে পড়ছিল সারদা কেলেঙ্কারিতে তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের কথা।

রাজীব কুমার বলেন, 'কথা বলার থেকে কাজ বড়ো। ... কথা নয়, কাজ দিয়ে এটা বজায় রাখতে হয়।' কর্মের কথা বলেছেন রাজীব কুমার। রাজ্যের পুলিশ-প্রশাসনের ইতিহাসে দুঁদে পুলিশ অফিসারদের তালিকায় অবশ্যই লেখা থাকবে রাজীব কুমারের নাম। কলকাতা পুলিশ, সিআইডি থেকে চিট ফান্ড কেস হয়ে দিদি আপনি মানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধারণা, সব মিলিয়ে বহু উত্থান-পতন গিয়েছে এই পুলিশকর্তার জীবনে। আর একেবারে শেষলগ্নে এসে বড়ো কালি মাখালেন গায়ে। প্রথমে যুবভারতীর মেসিকাণ্ডে মারাত্মক দোষ। প্রিয় ম্যাডাম শোকজ করেছেন। তারপরে চাকরির আরও শেষের দিকে তিনি ম্যাডামকে ডাকাতিতে সাহায্য করেছেন বলে অভিযোগ। দিদি, অনেকে বলেনে, আপনি রাজীবকে এত কাছে থেকে দেখেছেন কারণ নাকি তাঁর ম্যাডাম মানে আপনার সব গোপন কম্মো জানেন এই পুলিশ কুমার।

সারদা চিট ফান্ড সংক্রান্ত তদন্তে

তাঁকে নির্বাচন কমিশন বার বার সরিয়ে দিয়েছে। আর ভোট মিটে গেলেই আপনি আবার নিয়ে এসেছেন। শুনেছি, কমিশন সরিয়ে দিলেও রাজীব কুমার নাকি আড়াল থেকে আপনাকে সাহায্য করত। কিন্তু এবারে কী হবে দিদি!

গুরুত্বপূর্ণ একাধিক নথি, তথ্যপ্রমাণ লোপাটের অভিযোগ ওঠে তাঁর বিরুদ্ধে। ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে রাজীব কুমারের বাড়িতে হানা দেয় সিবিআই। সেই যে আপনি বাধা দিলেন এবং ধরনায় বসলেন। সব মনে পড়ছে দিদি।

অবসর গ্রহণের দিন রাজীব কুমার বললেন, তিনটি দেশের সঙ্গে সীমান্ত রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের— নেপাল, ভুটান ও বাংলাদেশ। ফলে ওই দেশগুলিতে কোনো কিছু হলেই তার প্রভাব এসে পড়ে পশ্চিমবঙ্গে। এই কথাটা তো দিদি আমারও কথা। পশ্চিমবঙ্গের নিরাপত্তা যে জাতীয় স্বার্থে প্রয়োজন সেই কথাটা এখন রাজীব কুমারের বিবেক বললেও এতদিন কেন বলেনি! তিনি কেন তাঁর ম্যাডামকে মানে আপনাকে বলেননি, সীমান্তে ফেন্সিঙের জন্য বিএসএফকে জমি দেওয়া দরকার। রাজ্যে এত অনুপ্রবেশ ঠিক নয়। কেন বলেননি মালদহ, মুর্শিদাবাদ জঙ্গিদের এবং হিন্দুবিরোধী বাংলাদেশি জেহাদিদের ঘাঁটি হয়ে যাচ্ছে। রাজ্যের পুলিশ প্রধান থাকার সময়ে কেন তিনি সতর্ক করেননি পুলিশকে। কেন সীমান্ত এলাকায় রাজনীতির স্বার্থে তৃণমূল যা যা করছে তার বিরোধিতা করেননি। পুলিশকে কেন সতর্ক থাকতে বলেননি বাংলাদেশ সীমান্তের পাচারচক্র নিয়ে?

এইসব প্রশ্নগুলো না আমায় বড্ড ভাবাচ্ছে দিদি। বড্ড ভাবাচ্ছে। সামনে ভোট। কিন্তু অতীতেই রাজীব কুমার এমন সব কাজ করেছেন যে তাঁকে নির্বাচন কমিশন বার বার সরিয়ে দিয়েছে। আর ভোট মিটে গেলেই আপনি আবার নিয়ে এসেছেন। শুনেছি, কমিশন সরিয়ে দিলেও রাজীব কুমার নাকি আড়াল থেকে আপনাকে সাহায্য করত। কিন্তু এবারে কী হবে দিদি! কোনো একটা পদ তৈরি করে রাজীবকে রেখে দিলে কেমন হয়।

আমার অপরাধ নেবেন না। আর এই অধমের প্রস্তাবটা প্লিজ মাথায় রাখবেন।

অতিথি কলম

প্রদীপ সিংহ

তুষ্টীকরণের রাজনীতি এবং তার পরিণতি ঃ এক বিশ্লেষণ

মমতা ব্যানার্জির দ্বিমুখী খেলা— একদিকে বাবরি মসজিদ হবে, অন্যদিকে জগন্নাথ মন্দির — এটা একেবারে দু'নৌকায় পা দিয়ে চলার চেষ্টা। আর এতে তিনি মাঝ নদীতে পড়ে যাবেনই। তখন তাঁকে কেউ বাঁচাতে পারবে না। ইতিহাস অন্তত তাই-ই বলে।

যাদের ইতিহাস নিয়ে খুব সমস্যা থাকে বিশেষ করে যখন ইতিহাসের আসল সত্য বলা হয় তখন তাদের সমস্যা আরও বেড়ে যায়। কিন্তু ইতিহাসের মধ্যেই তো আসল সত্য লুকিয়ে থাকে। ইতিহাস আমাদের বলে দেয়, যদি ভবিষ্যৎ গড়তে বা সংশোধন করতে চাই, তাহলে কোন ভুলগুলো করা উচিত নয়। ইতিহাস একরকমভাবে ভবিষ্যতের জন্য আমাদের শিক্ষা দেয় যে, কোন ভুলের ভুলের পুনরাবৃত্তি করা যাবে না বা কোন ভুল একেবারেই করা উচিত নয়। কিন্তু কিছু মানুষ আছেন যাঁরা ইতিহাস থেকে বা অন্যের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিতে রাজি নন। তাঁরা নিজেরা ভুল করার পরেই বুঝতে পারেন যে ভুল করেছেন। আবার এমন অনেক মানুষও আছেন যাদের সে বোধটুকুও নেই।

এই প্রসঙ্গেই আবার বলছি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর দলকে নিয়ে। মমতা ব্যানার্জি এবং তাঁর দল যা করছে তা লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে যে আমি কেন ইতিহাসের কথা বললাম। প্রথমে দেখা যাক মমতা ব্যানার্জি এবং তাঁর দল কী করছে। মমতা ব্যানার্জি এবং তাঁর দল তৃণমূল কংগ্রেস দুই নৌকায় পা রেখে চলার চেষ্টা করছে। মুসলমান তোষণের জন্যই এই দল— এটাই এই দলের পরিচয়। কিন্তু এখন তাদের মনে হচ্ছে এই পরিচিতি তাদের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। তাই এতে কিছু পরিবর্তনের প্রয়োজন বলে তারা মনে করছে।

এই পরিবর্তনের অংশ হিসেবেই মমতা ব্যানার্জি পশ্চিমবঙ্গে মন্দির তৈরি করছেন। এর উদ্দেশ্য হলো তিনি হিন্দুদের সঙ্গেও আছেন, এই বার্তা দেওয়া। মনে রাখতে হবে, তিনি হিন্দুদের সঙ্গে আছেন এটা শুধুই রাজনীতি, তিনি আসলে মুসলমানদের সঙ্গে আছেন। মুসলমানরা তাঁর কাছের মানুষ, তাঁর কোর ভোটব্যাংক। হিন্দুরা যদি তাঁকে সমর্থন না করে, তাহলে শুধু কোর ভোটব্যাংক দিয়ে নির্বাচনে জেতা যাবে না। এই বিষয়টা মমতা ব্যানার্জি বুঝতে পেরেছেন।

বিজেপি ধারাবাহিকভাবে তাদের জনসমর্থন বাড়িয়ে চলেছে। যতদিন সিপিএম বা কংগ্রেসের থেকে চ্যালেঞ্জ ছিল ততদিন হিন্দু ভোটারদের কাছে টানার চেষ্টায় কোনো সমস্যা ছিল না। কারণ মুসলমান ভোটব্যাংকের ওপর তৃণমূল কংগ্রেসের নয়, সিপিএমেরও প্রভাব ছিল। মুসলমান ভোটব্যাংক পশ্চিবঙ্গে কংগ্রেসের ত্রিশ বছরের শাসনকালে একচেটিয়া ছিল। তারপর সিপিএম পরিচালিত বামফ্রন্টের চৌত্রিশ বছরের শাসনকালে তাদের একচেটিয়া হয়। কিন্তু ২০১১ সাল থেকে টানা মমতা ব্যানার্জির কোর ভোটব্যাংকে পরিণত হয়েছে এরাজ্যের মুসলমানরা।

২০১১, ২০১৬ ও ২০২১— এই তিনটি নির্বাচনে মমতা ব্যানার্জির হিন্দু ভোট নিয়ে কোনো দুশ্চিন্তা ছিল না। এখানে যে হিন্দু ভোটের কথা বলা হচ্ছে তা তথাকথিত সেকুলার হিন্দুদের কথা বলা হচ্ছে, অর্থাৎ যারা ছদ্ম সেকুলার। এই হিন্দুরা তৃণমূলকে ভোট দেবেই, এটা মমতা ব্যানার্জির জানা। আসলে এই ছদ্ম সেকুলার হিন্দুরা জন্মসূত্রে হিন্দু হলেও তারা মানসিকভাবে মুসলমান। প্রতিটি মুসলমান বিষয়ে এদের হিন্দুদের বিরুদ্ধে কথা বলতেই দেখা যায়। এই ধরনের হিন্দুরাই কংগ্রেস, সিপিএম ও তৃণমূলের মতো দলগুলির ভরসা হয়ে ওঠে। এরা সবসময় হিন্দু ভোটকে বিভক্ত করে থাকে। মুসলমান ভোট একজোট থাকে আর এদের কারণে হিন্দু ভোট বিভক্ত হয়ে কংগ্রেস ও টিএমসি-র মতো দলগুলোর পক্ষে সেটা বড়ো সহায়ক হয়, তাদের জয় এনে দেয়, ক্ষমতায় রাখে।

কিন্তু এই যে তাদের তত্ত্ব বা ধারণা, তাতে তারা আসন্ন নির্বাচনের মুখে বিপদে পড়েছে। তাই মমতা ব্যানার্জি তাঁর দলের বিধায়ক হুমায়ুন কবীরকে দল থেকে শুধু সাসপেন্ড করেছেন, তার বেশি কিছু করেননি। তিনি মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গায় বাবরি মসজিদ বাননোর কথা বলেছেন। আজকের দিনে বাবরি মসজিদ কারা বানাতে পারে? যারা ভারতে শারিয়া আইন চালু করতে চায়, যারা ভারতকে দার-উল-ইসলাম বানাতে চায়। ভারতের মুসলমানদের সঙ্গে বাবরের সম্পর্ক কী? বাবর তো একজন আক্রমণকারী ছিল। সে হিন্দুদের ওপর অত্যাচার করেছে, ধর্মান্তরিত করেছে, মন্দির ধ্বংস করেছে, সম্পদ লুণ্ঠন করেছে, যতরকম অত্যাচার করা যায় সবই করেছে। সেই বাবর কীভাবে কারও

আদর্শ হতে পারে? কোন মুসলমানরা বাবরকে আদর্শ মনে করে? যারা করে তারা তো ভারতীয় হতে পারে না। তাদের মনে ভারতীয়ত্ববোধ থাকতে পারে না। তারা ভারতকে আদর্শ মনে করতে পারে না। তারা ভারতকে নিজের দেশ বলে মনে করতে পারে না।

মমতা ব্যানার্জি এবং তাঁর মতো মানুষদের এসব চিন্তা করার ক্ষমতা নেই। তাদের কাছে একটা বিষয়ই গুরুত্বপূর্ণ, তা হলো কারা তাদের ভোট দেবে? যারা ভোট দেবে তাদেরই মাথায় করে রাখবে। তারা ভারতবিরোধী হলেও। তাই তারা হুমায়ুন কবীরকে মসজিদ বানানোর ছাড় দিয়ে রেখেছেন। তার বিরুদ্ধে প্রকৃত অর্থে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। শুধু দেখানোর জন্য সাসপেন্ড করা হয়েছে। সাসপেন্ড মুখ্যমন্ত্রী করেননি, ফিরহাদ হাকিমকে দিয়ে করানো হয়েছে। ওদিকে আবার হিন্দুদের বোকা বানানোর চেষ্টা করা হয়েছে জগন্নাথ মন্দির বানিয়ে। জগন্নাথ মন্দির তো ওড়িশাতেই রয়েছে। মমতা ব্যানার্জি পনোরো বছর ক্ষমতায় রয়েছেন, মন্দির বানানোর কথা তো তাঁর মনে পড়েনি! ইসলামি শাসনে পশ্চিমবঙ্গে যে মন্দির ধ্বংস করা হয়েছে, তা পুনর্নির্মাণের কথা তো তিনি বলেননি? বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর যে অত্যাচার চলছে, হিন্দুদের নৃশংসভাবে হত্যা করা হচ্ছে, মন্দির ভেঙে ফেলা হচ্ছে, মা-বোনোদের বলাৎকার করা হচ্ছে, তা নিয়েও তো তিনি কিছু বলেননি! পশ্চিমবঙ্গেও যে মুর্শিদাবাদ জেলায় হিন্দুদের ওপর অত্যাচার করে তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে তা নিয়েও তো কোনো উচ্চবাচ্য করেননি! যারা একাজ করছে তাদের তিনি থামানোর চেষ্টাও করেননি। বরং ছাড় দিয়ে রেখেছেন— নিজেদের মতো কাজ করতে থাকো।

তাই শুরুতেই আমি যে কথাটি বলেছিলাম — দুনৌকায় পা দিয়ে চলা এবং ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেওয়া। সেই কথাটা হিন্দুদের মনে রাখা উচিত। ১৯৮৬ সালের পরের সময়টা মনে করতে হবে। ১৯৮৪ সালে রাজীব গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় আসার দু'বছর পেরুতে না পেরুতে সবকিছু যেন কর্পূরের মতো উবে যেতে লাগল। সকলেরই মনে আছে, ১৯৮৬ সালে শাহবানো মামলার রায়ের কথা। সুপ্রিম কোর্ট সেই রায় দিয়েছিল। শাহবানো ছিলেন একজন মুসলমান মহিলা। তাঁর স্বামী তাঁকে তালাক দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন তাঁর স্বামীর তৃতীয় বা চতুর্থ স্ত্রী। তাঁর স্বামী তাঁকে ভরণপোষণ দিতে অস্বীকার করেছিলেন। মামলা সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত গড়ায়। সুপ্রিম কোর্ট তার রায়ে জানায়, তালাকপ্রাপ্ত হলেও শাহবানোর খোরপোশের দায়িত্ব তাঁর স্বামীকে দিতে হবে।

এরপর মোল্লা-মৌলবিরা প্রধানমন্ত্রী রাজীর গান্ধীর কাছে দরবার করে। বলে, এটা তাদের মজহবের বিষয়। কী আশ্চর্য, একজন মহিলাকে খোরপোশ দেওয়াটা নাকি মজহবের বিষয়! সেই সময় রাজীব গান্ধী মন্ত্রীসভার সদস্য আরিফ মহম্মদ খান লোকসভায় দাঁড়িয়ে সুপ্রিম কোর্টের রায়ে পক্ষে ভাষণ দেন। কিন্তু পরদিনই তিনি জানতে পারেন যে সরকার একটি বিল আনতে চলেছে যার মাধ্যমে সুপ্রিম কোর্টের রায় উলটে দেওয়া যাবে। সেই সময় কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় ছিলেন পি ভি নরসিমহা রাও, যিনি পরে প্রধানমন্ত্রী হন। তিনি আরিফ মহম্মদ খানকে বলেন— ভাই, এই দেশের মুসলমানরা যদি অন্ধকারে থাকতে চায় থাকতে দিন, আপনি কেন নিজের শরীর-মন খারাপ করছেন তাদের জন্য? বিরক্ত খানসাহেব বলেন, এটা অধিকার, ন্যায় এবং সংবিধানের প্রশ্ন— আমি তার পক্ষেই থাকবো। এর পরই তিনি মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করেন এবং কংগ্রেস ও রাজীর গান্ধীর সঙ্গে সকল সম্রব ত্যাগ করেন।

তাহলে ১৯৮৬ সালে রাজীব গান্ধী কী করলেন? কট্টরপন্থী মুসলমানদের খুশি করার জন্য সুপ্রিম কোর্টের রায় পরিবর্তন করে দিলেন। তখন তিনি বলেছিলেন, হিন্দুপক্ষকে খুশি করে দাও। তাই অযোধ্যায় শ্রীরামমন্দিরের তালা দিয়ে খুলে শিলান্যাস করানো হলো। তারপর মুসলমানরা প্রতিবাদ করলে মন্দির নির্মাণের প্রক্রিয়া বন্ধ করে দিলেন। রাজীব গান্ধীর ধারণা ছিল, এতে হিন্দু ও মুসলমান দু'পক্ষই খুশি হবে এবং দু'পক্ষই তাঁর পাশে দাঁড়াবে। কিন্তু ফল হলো উলটো, কেউই খুশি হলো না। এর পরিপ্রেক্ষিতে দেশজুড়ে এক বৃহৎ আন্দোলন দানা বাঁধলো— শ্রীরামজন্মভূমি মুক্তি আন্দোলন এবং তার চূড়ান্ত পরিণতি ঘটে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর শাসনকালে অযোধ্যায় এক ভব্য মন্দির নির্মাণের মাধ্যমে। তাই রাজীব গান্ধী যে ভুল করেছিলেন তার মূল্য কংগ্রেস দল আজও দিয়ে চলেছে।

আমি ১৯৮৬ থেকে আজ ২০২৪ সালের কথা বলছি। এই সময়ের মধ্যে কংগ্রেস কখনো লোকসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা তো দূরের কথা। এটাই কংগ্রেসের গত ৪০ বছরের ইতিহাস। এই ৪০ বছরে, ১৯৮৪ সালের পর কংগ্রেস লোকসভায় সর্বাধিক যে আসনসংখ্যা জিতেছিল, তা ছিল ২০০৯ সালে— ২০৬টি আসন। ওই ২০৬টি

শোক সংবাদ

মালদা নগরের স্বয়ংসেবক তথা বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উত্তরবঙ্গ প্রান্ত সেবা টোলির সদস্য গোপাল কুণ্ডুর দাদা কৃষ্ণ কুণ্ডু গত ১৩ জানুয়ারি পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭১ বছর। তিনি তাঁর সহধর্মিণী,৩ ভাই, ৩ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

স্বস্তিকার বিজ্ঞাপনের দরপত্র (এক সপ্তাহের জন্য)

Back Cover	(Multi Colour)	Rs. 32,000.00
Front Inside	(Multi Colour)	Rs. 25,000.00
Back Inside	(Multi Colour)	Rs. 25,000.00
Full Page	(Multi Colour)	Rs. 20,000.00
Full Page	(Black & White)	Rs. 15,000.00
Half Page	(Black & White)	Rs. 8,000.00
Qtr. Page	(Black & White)	Rs. 4,000.00

*** বিজ্ঞাপনের টাকা জমা পড়লে বিজ্ঞাপন ছাপানো হবে।*

যোগাযোগ — মো : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

আসনের পেছনে বড়ো অবদান ছিল মুলায়ম সিংহ যাদবের। যখন তিনি কল্যাণ সিংহের সঙ্গে সমঝোতা করেন তখন উত্তরপ্রদেশের মুসলমান ভোটব্যাংক তাঁর ওপর অসন্তুষ্ট হয় এবং বড়ো অংশ কংগ্রেসের দিকে চলে যায়। এর ফলেই কংগ্রেস ২০০৯ সালের সাধারণ নির্বাচনে উত্তরপ্রদেশ থেকে ২১টি আসন জেতে এবং পরে এক উপনির্বাচনে আরও একটি মোট ২২টি আসন। এটাই উত্তরপ্রদেশ থেকে কংগ্রেসের জন্য লোকসভায় সর্বোচ্চ সাফল্য। এরপর আর কখনো তার কাছাকাছিও পৌঁছতে পারেনি। ২০১৯ সালে তো একটিমাত্র আসনে নেমে এসেছিল। বর্তমানে ২০২৪ সালে সমাজবাদী পার্টির সঙ্গে জোট করে লড়ে তাদের হাতে রয়েছে ৬টি আসন।

রাজীব গান্ধী যে ভুল করেছিলেন, যার শাস্তি কংগ্রেস এখনো ভোগ করে চলেছে— সেই ইতিহাস, সেই অতীত থেকে মমতা ব্যানার্জি কোনোরকম শিক্ষা নিতে প্রস্তুত নন। ইতিহাস ভবিষ্যতের রাস্তা দেখায় এবং বলে যে, দু'নৌকায় পা রেখে চলা উচিত নয়। দুই নৌকায় পা রাখলে মাঝখানে পড়ে জলে ডুবে যাওয়ারই আশঙ্কা বেশি। এর ফলেই কংগ্রেস দল ডুবে গেছে।

মমতা ব্যানার্জি তাঁর রাজনৈতিক জীবনে প্রথমবার দুটি নৌকায় পা দিচ্ছেন। গোস্বামী তুলসীদাস বলেছেন, একটিকে সাধলে সব সিদ্ধি হয়, আব সবকটিকে সাধলে সবই হাতছাড়া হয়। অর্থাৎ একটিকে লক্ষ্য করে এগুলে সবকিছু সামলে নেওয়া যায় কিন্তু সবাইকে খুশি করতে গেলে শেষপর্যন্ত কেউই খুশি থাকে না। মমতা ব্যানার্জির ক্ষেত্রেও ঠিক সেটাই ঘটতে দেখা যাচ্ছে।

এই যে দ্বিমুখী কার্ড তিনি খেলছেন, একদিকে বলছেন 'মুসলমানরাও আসুন', অন্যদিকে 'হিন্দুরাও আসুন'। তুষ্টীকরণের নামে বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গা মুসলমানদের রক্ষা করতে হবে, আবার জগন্নাথ মন্দিরও বানাতে হবে — এই অবস্থায় কোন হিন্দু মমতা ব্যানার্জির ওপর বিশ্বাস রাখবে? আর আমি যখন 'কোন হিন্দু' বলছি, তখন ছদ্ম সেকুলার হিন্দুদের কথা বলছি না। আমি বলছি সেই সব প্রকৃত হিন্দু, সনাতনী হিন্দুদের কথা। তাঁরা কেন মমতা ব্যানার্জির ওপর ভরসা রাখবেন?

তিনি ইতিহাস বা অতীত থেকে কোনো শিক্ষা নিতে রাজি নন। একটা কথা আছে— 'যাকে ভগবান দারুণ দুঃখ দিতে চান, আগে তার বুদ্ধি হরণ করেন।' মমতা ব্যানার্জির ক্ষেত্রেও সেটাই হচ্ছে।

যদি মমতা ব্যানার্জি মনে করেন পশ্চিমবঙ্গে জগন্নাথ মন্দির বানালেই হিন্দুরা তাঁর পক্ষে চলে আসবে, তাহলে এর চেয়ে ভুল আর কিছু হতে পারে না। যিনি বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারী মুসলমানদের ভোটার তালিকায় নাম রেখে দিয়ে দেশের সংহতি ও অখণ্ডতা নষ্ট করতে চান, তাঁর সঙ্গে থাকা মানে কী সেটা আমি বহুবার বলেছি, আবারও বলছি। দুষ্যন্ত কুমারের সেই গজলটা মনে করুন—

'উনকী অপীল হ্যায় কি উন্‌হেঁ হম মদত করেঁ।।
চাকু কী পসলিয়োঁ সে গুজারিশ তো দেখিয়ে।।'

অর্থাৎ তার অনুরোধ হলো আমরা তাকে সাহায্য করি। কিন্তু তার ছুরির ফলা থেকে আসা অনুরোধাটা তো দেখুন! মমতা ব্যানার্জির আবেদনটাও ঠিক তেমনই। মানে— আমরা সরকার চালাবো অনুপ্রবেশকারী, জেহাদি মুসলমানদের জোরে, আর তাতে আপনাদের অর্থাৎ হিন্দুদেরও সহায়তা চাই। কারণ এবার শুধু মুসলমানদের শক্তিতে ক্ষমতা ধরে রাখাটা কঠিন হয়ে পড়েছে।

হিন্দুদের বুঝতে হবে, শুধু মুসলমান, আর মুসলমানদের মধ্যেও যারা বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারী, তারাই মমতা ব্যানার্জির অগ্রাধিকার। এখন তাদের সংখ্যার জোরেও যখন মনে হচ্ছে ক্ষমতায় পৌঁছানো যাবে না, তখন হিন্দুদের বলা হচ্ছে দেখো, তোমাদের জন্য মন্দির বানাচ্ছি, তোমরাও এসো।

কিন্তু শুধু মন্দির বানালেই কোনো হিন্দু কোনো দলের সঙ্গে আসে না। ১৯৯২ সালে অযোধ্যায় বাবরি ধাঁচা রামভক্তরা অপসারণ করেছিল। কিন্তু ১৯৯৩ সালে উত্তর প্রদেশে যখন নির্বাচন হলো, তখন বিজেপি হেরে গিয়েছিল। পাঁচশো বছরের সেই কলঙ্কের চিহ্ন অপসারিত হলেও হিন্দুরা বিজেপির সঙ্গে যায়নি। আমি আবারও বলছি, ইতিহাসের ঘটনাই ভবিষ্যতের শিক্ষা। এই সত্যটা মমতা ব্যানার্জি বুঝতে রাজি নন।

তাঁর দ্বিমুখী খেলা— একদিকে বাবরি মসজিদ হবে, অন্যদেকে জগন্নাথ মন্দির — এটা একেবারে দু'নৌকায় পা দিয়ে চলার চেষ্টা। আর এতে তিনি মাঝ নদীতে পড়ে যাবেনই। তখন তাঁকে কেউ বাঁচাতে পারবেন না। ইতিহাস অন্তত তাই-ই বলে। অতীতের ঘটনা সেটাই প্রমাণ করে। আবার মনে করুন, কংগ্রেসের এক সময় লোকসভায় ৪১৪ টি আসন ছিল। সেখান থেকে নেমে এল ১২২-এ। আর আজ ৯৯-এ। মমতা ব্যানার্জি ঠিক এই পথ ধরেই হাঁটছেন, যে পথে হেঁটে রাজীব গান্ধী কংগ্রেসকে ডুবিয়েছেন।

এখন পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনে মনে হচ্ছে, যতটা ভাবা হয়েছিল, বিজেপিকে হয়তো ততটা পরিশ্রম করতে হবে না। কারণ মমতা ব্যানার্জি নিজেই অনেকটা সাহায্য করে দিচ্ছেন। সবচেয়ে বড়ো কথা, তিনি ইতিহাস বা অতীত থেকে কোনো শিক্ষা নিতে রাজি নন। একটা কথা আছে— 'যাকে ভগবান দারুণ দুঃখ দিতে চান, আগে তার বুদ্ধি হরণ করেন।' মমতা ব্যানার্জির ক্ষেত্রেও সেটাই হচ্ছে। তিনি বুঝতেই পারছেন না যে তিনি কী ভুল করে চলেছেন আর তার পরিণাম কী হতে চলেছে। পরিণাম কিন্তু খুব স্পষ্ট। এপ্রিলের শেষদিকে বা মে'র প্রথম সপ্তাহে যখন বিধানসভা নির্বাচনের ফল বের হবে, তখন সব পরিষ্কার হয়ে যাবে। তখন মমতা ব্যানার্জি নিজেও বুঝবেন তিনি কত বড়ো ভুল করেছেন। কিন্তু আপাতত তিনি মনে করছেন এটাই তাঁর মাস্টার স্ট্রোক— তিনি নাকি দু'পক্ষকেই একসঙ্গে খুশি করতে পারবেন। এই ভুল ধারণা ভাঙতে আর কয়েক মাস বাকি।

(লেখক রাজনৈতিক বিশ্লেষক তথা 'আজ কা আখবার'-এর সম্পাদক)

ইসলামি বিশ্বের শেষ গন্তব্য— সনাতন ধর্ম

শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী

সালটা ১৯৯৭। সে বছর দেশজুড়ে স্বাধীনতার ৫০তম বর্ষ উদ্‌যাপন চলছিল। কলকাতার মহাজাতি সদনে ভারত সরকারের সহযোগিতায় বিদ্যাভারতীর উদ্যোগে আয়োজিত হয়েছিল সারারাত ব্যাপী এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। হলে তিল ধারণের জায়গা ছিল না। পর্দা সরতে দেখা গেল মঞ্চে বসে প্রবাদপ্রতিম সঙ্গীত শিল্পী ভি বালসারা এবং তাঁর যন্ত্রসঙ্গীত সাথীরা। মৃদু আলো। ভি বালসারা বলতে শুরু করলেন— ‘‘আমার পূর্বপুরুষের জন্মভূমি পারস্য। সেদেশে যখন ধর্মীয় নিপীড়ন শুরু হলো আমার পূর্বপুরুষেরা ধর্ম বাঁচাতে ভিখারির মতো চলে এসেছিলেন এই ভারতমায়ের কোলে। আমরা তার বুকে ঠাঁই পেয়েছিলাম। সেই ভারতজননীকে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়ে শুরু করছি আমার অনুষ্ঠান।’’ তারপর পিয়ানো অ্যাকোডিয়ামে শুরু করলেন ‘ধনধান্য পুষ্প ভরা’ গানের সুর মূর্ছনা।

অনেকেই জানেন পারস্য দেশটির বর্তমান নাম। যে দেশ থেকে ভি বালসারা, জামশেদজী টাটা প্রমুখ স্বনামধন্য মানুষের পূর্বপুরুষরা কেবলমাত্র নিজেদের ধর্ম বাঁচাতে প্রিয় জন্মভূমি ছেড়ে ভারতে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সেদেশের উপাসনা পদ্ধতি কী ছিল তা অনেকেই হয়তো আজ জানেন না। ১৪০০ বছর আগে সে দেশের সকল মানুষই ছিলেন পার্শি। অগ্নি ও সূর্যের উপাসক। জরাথুস্টের অনুগামী। সনাতন সংস্কৃতির অনুসারী। তাঁদের পতাকা ছিল সূর্য অগ্নি ও সিংহ চিহ্নযুক্ত।

অতীতের সেই পারস্যই আজকের ইরান। প্রাচীনকালে পারস্যে শাসনীয় নামে একটি শক্তিশালী সভ্যতা ও সাম্রাজ্য ছিল। সেখানকার সম্রাট ছিলেন কিসরা বা খসরু পারভেজ। হযরত মহম্মদ প্রথমে মক্কায় ইসলাম প্রচার করতে তেমন সুবিধা করতে পারেননি। মদিনায় চলে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। মদিনায় এসে মুষ্টিমেয় অনুসারী নিয়ে শুরু করলেন জেহাদ। ইসলাম না মানলে যুদ্ধ। কখনো বাণিজ্যিক কাফিলার ওপর, কখনো মদিনার দুর্বল গোষ্ঠীগুলির ওপর, আবার কখনো-বা ইহুদি-খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের উপর আক্রমণ। ইসলামের চিরস্থায়ী বিধান হলো ‘এই পৃথিবী আল্লা এবং তার নবির। অমুসলমানদের এই পৃথিবীতে থাকার অধিকার নেই। হয় তারা নবির আদর্শ মেনে নেবে, নয় তারা মারা মরবে।’ একের পর এক যুদ্ধে রক্তের বন্যা বয়ে গেল। বেশ কিছু অঞ্চল দখলও হলো। ষষ্ঠ হিজরিতে নবি পারস্য সম্রাট খসরু পারভেজের কাছে চিঠি পাঠিয়ে ইসলামের দাওয়াত দিলেন, ‘হয় শান্তিপূর্ণভাবে ইসলাম গ্রহণ করো, নয়তো তাদের জন্য দুর্ভাগ্য অপেক্ষা করে আছে।’ পারস্য সম্রাট নবির দেওয়া এই চিঠি ছিঁড়ে ফেলে দিলেন। এই ঘটনায় নবি রুষ্ট হলেন কিন্তু এর বেশি কিছু করতে পারলেন না।

কারণ তখন পারস্য ছিল সামরিক শক্তিতে শক্তিধর এবং তার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা-জ্ঞান-বিজ্ঞানে এক উন্নত ভূখণ্ড। নবির জীবদ্দশায় পারস্যকে আর দখল করতে পারেননি। তার মৃত্যুর পর আবু বকরের শাসনকালে পারস্যের সাসানীয় সাম্রাজ্যকে ইসলামি শাসনের অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে যুদ্ধ শুরু হলো। অবশেষে ৬৪২ খ্রিস্টাব্দে ‘নাহবান যুদ্ধে’ মুসলমানরা সাসানীয় সাম্রাজ্য ধ্বংস করল। প্রাচীন পারস্যের শাসন ক্ষমতা এলো মুসলমানদের হাতে। তারপর ৬৪২ থেকে ১৯৭৯। ১২৭৭ বছর ধরে ক্ষমতার কামড়াকামড়ি আর পালাবদল চলছিল ইসলামকে ব্যবহার করে। ১৯২৫ সালে ক্ষমতায় এলেন রেজা শাহ পাহলভী। তিনি মুসলমান হয়েও ছিলেন তুলনামূলক প্রগতিশীল। তিনি পারস্যকে আধুনিকীকরণ করেছিলেন। ইসলামি প্রথা ও সামাজিক নিয়মে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছিলেন। নারীদের পর্দা প্রথা ঐচ্ছিক করেছিলেন। ইরান তখন মোটামুটি ভালোই ছিল। কিন্তু কথায় আছে কোনো শাসকই কোনোকালে সকল প্রজাকে সুখী করতে পারে না। এত কিছুর পরেও সাধারণ মানুষের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিল। ১৯৭৯ সালে আয়াতুল্লা খোমেইনির নেতৃত্বে ব্যাপক বিক্ষোভ আর অভ্যুত্থান ঘটলো। অবশেষে প্রগতিশীল মহম্মদ রেজা শাহ শাসনের অবসান হয়ে কট্টর ইসলামি আয়াতুল্লাহ খোমেইনির জমানা শুরু হলো। এই হলো ইরানের ইতিহাস।

আজ ৪৭ বছর পর ইরানের জনতা এক নতুন লড়াই শুরু করেছে। মুক্তির লড়াই। কীসের মুক্তি? ইসলামের বর্বরতা থেকে মুক্তি। ইসলামের নামে স্বৈরাচারী খোমেইনি তাদের পায়ে যে শেকল পরিয়েছে তার থেকে মুক্তি। ইরানের রাস্তায় এক নারী হিজাব ছাড়া, খোলা চুলে, দুই ঠোঁটের মাঝে সিগারেট নিয়ে খোমেইনির ছবিতে আগুন জ্বালিয়ে সেই আগুনে সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়ছে। এই দৃশ্য নিঃসন্দেহে একবিংশ শতাব্দীর

ভারতবর্ষ তার সনাতন সভ্যতা, সনাতন ধর্ম, সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য পৃথিবীর কোনো দেশ আক্রমণ করেনি, ধর্মের কারণে কাউকে আঘাত করেনি, কাউকে দাস বানায়নি, নারীকে ‘গনিমতের মাল’ বলে ভাগ করে নেয়নি। তাই হাজার হাজার বছর ধরে সনাতন ধর্ম আদি-অনন্ত-অবিনশ্বর।

ফঃ ২

এক বিদ্রোহ। এই ছবিতে কেবল খোমেইনি জ্বলছে না, মুসলমান মেয়েটির সিগারেট থেকে বের হওয়া আগুন ইরানকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে দিচ্ছে। ভেঙে দিচ্ছে ইসলামের শৃঙ্খলকে। এই মুসলমান মেয়েটি, যার খোলা চুল, পরনে জিন্সের প্যান্ট স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে ২০২২ সালের কথা। মনে করিয়ে দিচ্ছে সেই প্রতিবাদী নারী 'মাসাহা আমিনি'র কথা, যাকে ইরানের নীতি পুলিশ তুলে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলেছিল শুধু এই কারণে যে তার চুল খোলা ছিল, হিজাব ছিল না। আজ সেই দেশে খোমেইনির ছবিতে লাগানো আগুন, আর সেই আগুনে ধরানো সিগারেটের ধোঁয়া বলে দিচ্ছে ইরান জ্বলছে। লক্ষ লক্ষ যুবক-যুবতী পথে নেমে বলছে, 'আমরা ভীত নই। ৪৭ বছর আগেই মরে গিয়েছিলাম তখন তোমরা স্বাধীনতা কেড়ে নিয়েছিলে। এখন ভয় কেটে গিয়েছে, ভয়ের মৃত্যু ঘটেছে। মিথ্যা মজহবের ভয় দেখিয়ে তোমরা আর আমাদের দমিয়ে রাখতে পারবে না।'

যে মসজিদ আল্লার ঘর বলে সম্মান ও শ্রদ্ধার কেন্দ্রবিন্দু ছিল, সে মসজিদে তারা আগুন দিচ্ছে, ভাঙচুর করছে। রাজধানী তেহেরানে সবচেয়ে বড়ো মসজিদ-সহ শতাধিক মসজিদ পুড়িয়ে দিয়েছে। হ্যাঁ, যারা পোড়াচ্ছে তারা সকলেই মুসলমান। তারা বলছে কেবল আল্লার ভয় দেখিয়ে মানুষকে শোষণ করার দিন শেষ। অনেকে বলছেন ইরানে যা হচ্ছে তা বিদেশি চক্রান্ত। কথাটা পুরোপুরি সত্যি না হলেও এর পেছনে একটি যুক্তি অবশ্যই আছে। ইরানে আজ যে আগুন জ্বলছে তার অনুপ্রেরণা এসেছে সাতসমুদ্র পারের ভেনেজুয়েলার পটপরিবর্তন থেকে। সেখানে স্বৈরাচারী কমিউনিস্ট শাসক মাদুরোর শাসন ছিল। পেছনে সমর্থন ছিল চীন ও রাশিয়ার। ইরানের মানুষ যখন দেখলো ভেনেজুয়েলা থেকে মাদুরো উৎখাত হয়েছে, তারা স্বাধীনতা পাচ্ছে, উৎসব উল্লাস করছে, জীবনকে উপভোগ করছে, রিলিজিয়নের শৃঙ্খল নেই, তা দেখে ইরানের মানুষের মনে সাহস জেগেছে। তারা ভাবছে ভেনেজুয়েলায় এমন হতে পারলে ইরানে কেন নয়? যদি স্বৈরাচারী মাদুরোকে বিতাড়িত করা যায় তবে অত্যাচারী আয়াতুল্লাকে কেন নয়? ইরানের জনতা যখন বুঝে গেছে ভোটের মাধ্যমে পরিবর্তন আসবে না তখন তারা ঠিক করে নিয়েছে— রাজপথে প্রতিবাদই একমাত্র সমাধান। তাই তারা পথে নেমেছে। কেউ একে মার্কিন আগ্রাসন, ইহুদি ষড়যন্ত্র বলতেই পারেন!

কিন্তু এটা সত্য যে আজ ইরানে যা হচ্ছে তা ইরানিদের নিজেদের লড়াই। মজহবের বেড়ি থেকে মুক্তির লড়াই। মসজিদ পোড়ানো কোনো আমেরিকান করছে না, ইসলাম থেকে মুক্ত হওয়ার ঘোষণা আমেরিকার কেউ দিচ্ছে না। এ সবই করছে ইরানের সাধারণ মুসলমান যুবক-যুবতীরা। হাজার বছর ধরে ইরান ইসলামের শাসন দেখেছে, যেখানে প্রশ্ন করা হারাম, সমালোচনা করা দেশদ্রোহ, চিন্তা করা ফিতনা, সেই দেশের মানুষই বলছে, একটু সমালোচনা, চিন্তা করে দেখি না কী হয়? ইসলাম শান্তির মজহব, নামাজ হলো সব সমস্যার সমাধান— এইসব কথা তার আর গিলতে পারছে না। তাই ইরানের নবীন প্রজন্ম আধুনিক বিশ্বে বাঁচার কামনায় পথে নেমেছে। তাই ইরানের ঘটনা কেবল একটি আকস্মিক ঘটনা নয়। বরং ঈশ্বরের এক সুপরিকল্পিত কর্মকাণ্ডের অংশ। যে সনাতনী সভ্যতার প্রদীপ পারস্যের মাটিতে ১৪শো বছর আগে নিভিয়ে দেওয়া হয়েছিল, যার কিছুই অবশিষ্ট ছিল না, যে দেশের মানুষ এর ইতিহাস সংস্কৃতি ঐতিহ্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল, আজ তারাই তাদের না দেখা পূর্বপুরুষের সংস্কৃতিতে ফিরতে চাইছে।

আগামী তিন-চার বছর ইসলামি দুনিয়ার কাছে কঠিন সময়। হয়তো তারা সারা দুনিয়া থেকে পালাতে পালাতে শেষে মক্কা আর মদিনাতে এসে ঠাঁই নেবে। কারণ কেবল ইরানেই নয়, বহু ইসলামি দেশ আজ সাড়ে চোদ্দশো বছরের সংস্কারহীন একটি জগদ্দল মজহবকে বিদায় জানাতে চাইছে। সৌদি আরবের যুবরাজ মহম্মদ বিন সালমান আজ সেদেশের সমাজ সংস্কারক হিসেবে উদয় হয়েছেন। সেখানে আজ সিনেমা-সংগীতের চর্চা চলছে, বোরখা পরা ঐচ্ছিক হয়েছে, দুবাই ও আবুধাবিতে হিন্দু মন্দির গড়ে উঠছে, এমনকী দেশে মদের দোকান খুলছে। যে সৌদি আরবকে ইসলামি বিশ্বের প্রাণকেন্দ্র বলে মনে করা হয় সেখানে আজ সেই কাজগুলোই হচ্ছে যাকে ইসলামে হারাম বলা হয়েছে। সমীক্ষা বলছে, এত কিছু করা মানে মৃত্যুদণ্ড। ইউএই অর্থাৎ ইউনাইটেড আরব আমিরাত প্রথম থেকেই এই পথের পথিক। সেখানে সরকার তাদের দেশের ছাত্রদের ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে পড়তে যাওয়া নিষিদ্ধ করেছে। তাদের আশঙ্কা যে, এই ছাত্ররা লন্ডনে গিয়ে কট্টরপন্থী উগ্রবাদী হয়ে উঠবে। যে তুর্কি সর্বদা ইসলামি দুনিয়ার নেতৃত্ব দেওয়ার চেষ্টা করেছে সেই তুরস্কে আজ মুসলমান জনসংখ্যা ক্রমহ্রাসমান। প্রথমে সেখানে ৯৮ শতাংশ মুসলমান ছিল। এখন সেখানে ৯৫ শতাংশ। পিউ রিসার্চ অনুসারে, তুর্কিতে প্রতি চার শতাংশ মানুষ যারা জন্মগত মুসলমান, তারা আজ নিজেদের মুসলমান বলে পরিচয় দিতে চাইছে না। দেশের প্রায় ৭৩ শতাংশ যুবক-যুবতী ইসলামি আচার অনুষ্ঠান থেকে দূরে থাকছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা আরবি ভাষায় অনুবাদ হয়ে সাড়ে তিন কোটি বিক্রি হয়েছে। গত দু'তিন বছরের মধ্যে এসব ঘটেছে।

ইসলামিক দেশগুলির এখন করুণ অবস্থা। কেউ অপুষ্টি ও ক্ষুধার জ্বালায় ধুঁকছে, কেউ হিংসায় ভয়ার্ত, কেউ-বা ভ্রাতৃঘাতী গৃহযুদ্ধে ধ্বংসের মুখে। পাকিস্তানে মসজিদে মসজিদে বোমা বিস্ফোরণ করে যারা মারছে আর যারা মরছে তারা সকলেই মুসলমান। আফগানিস্তানের সঙ্গে পাকিস্তানের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে যারা প্রাণ হারাচ্ছে তারা সকলেই মুসলমান। আইএসআইএস উগ্রপন্থীরা ইরাক ও সিরিয়াতে যাদের হত্যা করছে, যে নারীদের যৌনদাসী বানাচ্ছে তারা সকলেই মুসলমান। ক'দিন আগে সুদানে ৩৫ হাজার মুসলমানকে তো মুসলমানেরাই হত্যা করেছে। এসবই প্রমাণ করে যে 'মুসলিম উম্মা' শব্দটি আজ অর্থহীন। এই অবস্থায় 'এক্স-মুসলমান' আন্দোলন পুরো দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ছে। এ কারণে সকলে আজ ইসলামের কট্টরতা-ক্রূরতা-হিংসা-জঙ্গিপনা থেকে মুক্তি পেতে চাইছে।

বিপরীতে, বিশ্বের সর্বত্র আজ সনাতনের স্তুতি ও জয়জয়কার। বিশ্বের সর্ববৃহৎ মুসলমান জনসংখ্যার দেশ ইন্দোনেশিয়া। কট্টরপন্থীরা শত চেষ্টা করেও সেখানে হিন্দু

সংস্কৃতি শেষ করতে পারেনি। সেখানকার অধিবাসীরা আজও হিন্দু সংস্কৃতিকে শুধুমাত্র প্রকাশ্যে মেনে চলেছে তাই নয়, বরং তার জন্য গর্ব অনুভবও করছে। ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী ইন্দোনেশিয়া ভ্রমণকালে সেখানে দেখেছিলেন সনাতন হিন্দু ধর্মের প্রভাব। বালি দ্বীপের একটি অনুষ্ঠানে রামলীলার অভিনয় দেখে সেখানকার বিদেশমন্ত্রীকে তিনি প্রশ্ন করেছিলেন, 'মুসলমান দেশ ইন্দোনেশিয়ায় রামলীলা, এ কেমন'? বিদেশমন্ত্রী উত্তর দিয়েছিলেন, 'আমরা আমাদের উপাসনা পদ্ধতি বদলেছি, সংস্কৃতি পালটাইনি। শ্রীরাম আমাদের পূর্বপুরুষ। তাই রামায়ণ গান আমাদের সংস্কৃতির অঙ্গ'। ইন্দোনেশিয়ার এয়ারওয়েজের নাম আজও গরুড় এয়ারওয়েজ। টাকার উপর সিদ্ধিদাতা গণেশের ছবি। রাষ্ট্রপতির নাম ছিল মেঘবতী সুকর্ণপুত্রী। ইন্দোনেশিয়া জুড়ে আজও সনাতন সংস্কৃতির প্রবাহ বয়ে চলেছে।

আজও থাইল্যান্ডের রাজধানীর নাম অযোধ্যা। থাইল্যান্ডের ঐতিহাসিক শহর আয়ুথায়া ১৩৫০ থেকে ১৭৬৭ সাল পর্যন্ত সিয়াম রাজ্যের রাজধানী ছিল এবং এর নাম অযোধ্যা থেকে নেওয়া হয়েছে, যা মর্যাদা পুরুষোত্তম শ্রীরামের জন্মস্থান। যদিও বর্তমান রাজধানী ব্যাংকক। কিন্তু প্রাচীন আয়ুথায়া ছিল একটি প্রধান, সমৃদ্ধ এবং বিশ্বজনীন রাজধানী যাকে প্রায়শই 'থাইল্যান্ডের অযোধ্যা' বলা হয়।

টিউনিসিয়া একমাত্র ইসলামি দেশ যারা প্রকাশ্যে ইসলাম ও শরিয়া কানুন পরিত্যাগ করে সেকুলার সংবিধান গ্রহণ করেছে। যখন থেকে এই দেশটি আরবি সংস্কৃতি থেকে মুক্তি পেয়েছে তখন থেকে সেখানে ধীরে ধীরে শান্তি ফিরে এসেছে। মানুষের জীবনে সুখ সমৃদ্ধি বিরাজ করছে।

ইসলামের নামে সৃষ্টি হওয়া পাকিস্তানের পরিস্থিতি সবচেয়ে ভয়াবহ। সেখানে ৪ লক্ষেরও বেশি মুসলমান সোশ্যাল মিডিয়ায় আজ শরিয়া আইনের বিরুদ্ধে সক্রিয়। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি মহিলারা। আর এই ঘটনা তখন ঘটছে যখন পাকিস্তানে ইসলামের বিরুদ্ধে একটি কথা বলার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। পড়শী ইরানে আজ যা কিছু ঘটছে তার ঢেউ যদি পাকিস্তানে আছড়ে পড়ে তবে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। মহেঞ্জোদারো-হরপ্পা, মহর্ষি পাণিনি— কোনোটিই ইসলামের পরিচয় বাহন করে না বরং সনাতন হিন্দু সভ্যতার উত্তরাধিকার। পাকিস্তানের নবীন প্রজন্ম আজ নতুন করে তার প্রাচীনত্ব জানতে চাইছে। সে দেশগুলির Zen-z প্রজন্ম ধীরে ধীরে সনাতনের অভাব অনুভব করতে শুরু করেছে। তাই বালুচিস্তান, পাখতুন, সিন্ধুপ্রদেশ, পঞ্জাব (পাকিস্তানের) আজ হিংলাজমাতার নামে জয়ধ্বনি দিচ্ছে। পাকিস্তান থেকে নিষ্কৃতি চাইছে। কট্টরতার মাঝে বাংলাদেশেও আজ মুক্তচিন্তার জয়জয়কার। মুফতি ইমরান বসির, আসাদ নূর থেকে শুরু করে বহু শিক্ষিত যুবক আজ ধীরে ধীরে ইসলামের সমালোচনায় মুখর।

ভারতের দক্ষিণে সমুদ্রের কোলে অবস্থিত রাজ্য কেরালা। ৬২৯ সালে হযরত মহম্মদের জীবদ্দশায় এখানেই ভারতের প্রথম চেরামন জামে মসজিদ তৈরি হয়েছিল। হিন্দুরাজা চেরামল পেরুমলের কার্যকালে তৈরি হয়েছিল এটি। সেই কেরালাতেই আজ এক নতুন আন্দোলন চলছে। এক্স ইসলামি আন্দোলন। শিক্ষিত যুবক-যুবতীরা ইসলামকে বিদায় জানাচ্ছে। এদের সংখ্যা প্রায় আড়াই লক্ষ। আর সারা ভারতে এই সংখ্যা প্রায় দু' কোটি। এদের কেউ কেউ ইসলাম ত্যাগ করছে, কেউ, নাস্তিক হচ্ছে, আবার কেউ সনাতনে ফিরে আসছে। মুসলমান মেয়েরাও সানন্দে হিন্দু ঘরে বিয়ে করতে চাইছে। কারণ এখানে চার বিবি নেই, কথায় কথায় তালাক নেই, নিকাহ হালালা নেই, নিকট আত্মীয়র সঙ্গে বিবাহ নেই, 'নারী তোমার শস্যক্ষেত্র' মজহবি বিধান নেই।

২০২১-এ ইন্ডিয়া টুডে প্রকাশিত 'পিউ রিসার্চ'-এর সমীক্ষা অনুসারে ভারতে কুড়ি কোটি মুসলমানের মধ্যে ৬ শতাংশ অর্থাৎ ১.২ কোটি মুসলমান নিজের মজহব থেকে দূরে থাকছেন। অনেকে হিন্দুধর্মই তাদের পূর্বপুরুষদের ধর্ম বলে বিবৃতি দিচ্ছেন। প্রাক্তন কংগ্রেস নেতা গুলাম নবি আজাদ, ফারুক আব্দুল্লা, অ্যাডভোকেট রিজিওয়ান আহমেদ, মহম্মদ ফাইয়াজ খান, সমাজকর্মী শুভহি খান, নাজিয়া ইলাহি খান, তসলিমা নাসরিন থেকে শুরু করে প্রাক্তন শিয়া বোর্ড প্রেসিডেন্ট ওয়াসিম রিজভী (বর্তমান নাম জিতেন্দ্র নারায়ণ সিংহ ত্যাগী)— সমাজের সর্বস্তরের প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিরা আজ বলছেন যে তাদের পূর্বপুরুষ হিন্দু ছিলেন। এদেশে সকলের ডিএনএ এক। মধ্যযুগীয় আরব মজহবের আচার বিচার আর বর্বরতা দেখে সকলেই ক্লান্ত।

যে জাতি শান্তি চায়, সমৃদ্ধি চায়, সৌভ্রাতৃত্ব চায়, তাকে সনাতনে ফিরতেই হবে। স্বামীজী ইসলাম ও খ্রিস্টান এই দুটিকেই সেমেটিক রিলিজিয়ন বলেছেন। বলেছেন 'খ্রিস্টমত বেয়নটের দ্বারা (বন্দুক) বাইবেল প্রতিষ্ঠা করেছে, আর ইসলাম তরবারির জোরে ইসলাম বিস্তার করেছে। ঈশ্বর মাত্র একজনই এবং মহম্মদ তার রসুল, এই সিদ্ধ বাক্যের বাইরে আর যা কিছু আছে সবই নিকৃষ্ট বস্তু এবং অবিলম্বে সেগুলিকে ধ্বংস করে ফেলতে হবে, এই হলো ইসলামের কথা। এ কথায় যে বিশ্বাস করে না সে পুরুষই হোক কিংবা নারী, মুহূর্তে তাকে হত্যা করা হবে, যা কিছু এই উপাসনা পদ্ধতির অন্তর্গত নয়, তাকে মুহূর্তের মধ্যে ধ্বংস করতে হবে। প্রশান্ত মহাসাগর থেকে শুরু করে আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত পাঁচশত বছর ব্যাপী পৃথিবীর বুকে এই এক কারণে রক্তের বন্যা বয়ে গিয়েছে। এই হলো ইসলাম।'

বিপরীতে, ভারতবর্ষ তার সনাতন সভ্যতা, সনাতন ধর্ম, সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য পৃথিবীর কোনো দেশ আক্রমণ করেনি, ধর্মের কারণে কাউকে আঘাত করেনি, কাউকে দাস বানায়নি, নারীকে 'গনিমতের মাল' বলে ভাগ করে নেয়নি। তাই হাজার হাজার বছর ধরে সনাতন ধর্ম আদি-অনন্ত-অবিনশ্বর। ইরান এই সত্য ধীরে ধীরে অনুভব করছে। তাই তারা তাদের আদি সংস্কৃতি অগ্নি উপাসনার ধর্মে ফিরতে চাইছে। আগামীকাল সারা বিশ্বও এই সত্য স্বীকার করবে। সনাতনের শিকড়ে ফিরবে। আজ থেকে প্রায় ২০০ বছর আগে পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর অন্তর্দৃষ্টিতে দেখেছিলেন এই সত্য। তাঁর ভাষায় 'আজকাল যত আধুনিক ধর্ম দেখছিস এ আসবে যাবে, সনাতন ধর্ম চিরকাল থাকবে।' ইরান দিয়ে বুঝি এই কথা সত্য হতে শুরু করেছে। □

বিকশিত ভারতের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় অর্থ বাজেট (২০২৬-২৭)

ড. রতন কুমার ঘোষাল

একথা আমরা সকলেই জানি যেকোনো আর্থিক বছরের (এক্ষেত্রে ১ এপ্রিল, ২০২৬ থেকে ৩১ মার্চ ২০২৭) বাজেট হলো ওই বছরের প্রস্তাবিত সরকারি আয় ও ব্যয়ের একটা খসড়া। এই বাজেট তৈরির আগে গত আর্থিক বছরে দেশের আর্থিক অবস্থার একটা সমীক্ষা প্রকাশিত হয়। যেটার পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান বাজেটে কোন খাতে কত ব্যয় করা হবে, কোন ক্ষেত্রকে গুরুত্ব বেশি দিতে হবে, আয় কোথা থেকে কত হবে তা ঠিক করা হয়। তবে এবছরের বাজেট তৈরিতে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীকে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়েছে।

প্রথমত, বিশ্বের অর্থনীতিতে ও বাজারে অনিশ্চিয়তা ও অস্থিরতা। দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন দেশের বিরুদ্ধে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের শুল্ক যুদ্ধ ঘোষণা। যার ফলস্বরূপ বিশ্বব্যাপী দ্রব্য ও পরিষেবার চাহিদা ও জোগানের শৃঙ্খল বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া। ফলত, আমদানি ও রপ্তানির বাজারের অনিশ্চয়তা। রপ্তানির বাজারের এই অনিশ্চয়তার মোকাবিলা করার জন্য দেশীয় বাজার সৃষ্টির উপর জোর দেওয়া। তৃতীয়ত, এই অনিশ্চয়তার মধ্যেও দেশের আর্থিক উন্নতির হার ৬.৮ শতাংশ থেকে ৭.২ শতাংশ ধরে রাখা। কারণ ভারত আর্থিক উন্নতির দিক থেকে বিশ্বের বহুদেশের থেকেই অনেক এগিয়ে। চতুর্থত, বর্তমানে ভারতের দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা অনেক কমেছে এবং বেকারত্বও কমেছে। এই কমে যাওয়াটা বজায় রাখাও একটা বড়ো চ্যালেঞ্জ। ভারতের অর্থমন্ত্রী দক্ষতার সঙ্গে এই সমস্ত চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবিলা করা চেষ্টা করেছেন এবং ভারতের উন্নতির হারকে উচ্চস্থানে ধরে রাখার চেষ্টা করছেন।

এর পাশাপাশি তিনি ফিসক্যাল ডেফিসিট বা রাজকোষ ঘাটতি (ঋণ বাবদ আয়-ব্যয়ের পার্থক্যকে) ও প্রাইমারি ঘাটতিকে একটা নিয়ন্ত্রিত মাত্রায় রাখার চেষ্টা করেছেন। ফিসক্যাল ঘাটতি গত বছরের জিডিপি-র ৪.৪ শতাংশ থেকে নামিয়ে এই বাজেটে ৪.৩ শতাংশ করেছেন। অন্যদিকে, ঋণ ও জিডিপি-র অনুপাত এবং গত বছরের ৫৬.১ শতাংশ থেকে নেমে ৫৫.৬ শতাংশ ধরা হয়েছে। ফলত, অনেক আর্থিক সম্পদ অন্যান্য উন্নয়ন কাজে ব্যবহার করা যাবে।

বর্তমান বাজেটে আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো ক্ষেত্রগত সম্পদ বণ্টন এমনভাবে করা হয়েছে যাতে একদিকে যেমন ক্ষেত্রগত ভারসাম্য বজায় থাকছে, অন্যদিকে দেশীয় বাজার সৃষ্টি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে। ফলত বৈদেশিক বাজারের (রপ্তানি ও আমদানি) অনিশ্চয়তা কাটিয়ে

উঠে আর্থিক প্রগতি অক্ষুণ্ণ থাকার সম্ভাবনা বেশি। এর পাশাপাশি দারিদ্র্য ও বেকারত্বের হার কম থাকবে। এখন দেখা যাক অর্থমন্ত্রী কীভাবে ওই চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবেলা করার দিকে এগিয়েছেন।

এ বছরের বাজেটে মোট প্রস্তাবিত সরকারি আয়ের মধ্যে (৫৩.৭ লক্ষ কোটি টাকার) মূলধন পাওনা ধরা হয়েছে ১৭.২ লক্ষ কোটি টাকা এবং রেভিনিউ পাওনা ধরা হয়েছে ৩৬.৫ লক্ষ কোটি টাকা। মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ৫৩.৫ লক্ষ কোটি টাকা। এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, মোট আয়ের মধ্যে ২৮ শতাংশ মূলধনী ব্যয় করা হবে অর্থাৎ ১২.২ লক্ষ কোটি টাকা। এই ব্যয়ের ফলে দেশে গুণক পদ্ধতিতে আয় ও নিয়োগ বৃদ্ধি পাবে। ফলে দেশের মধ্যে দ্রব্য সামগ্রিক মোট চাহিদা বৃদ্ধি পাবে। ফলত দেশীয় বাজার শক্তিশালী হবে ও বৈদেশিক বাজারের অনিশ্চয়তার হাত থেকে কিছুটা রেহাই হবে। প্রকৃতপক্ষে অর্থমন্ত্রী এই বিপুল পরিমাণ মুলধনী ব্যয় করবেন দেশের অর্থনৈতিক পরিকাঠামো উন্নয়নে, সামাজিক ক্ষেত্রে তথা সামগ্রীক আর্থিক উন্নতিতে। আসলে এই বাজেটে অর্থমন্ত্রী পরিকাঠামো ও সামাজিক ক্ষেত্রে, ম্যানুফ্যাক্চারিং ক্ষেত্রে বেশি জোর দিয়েছেন দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদার শৃঙ্খলকে জোরদার করার জন্য।

অন্যদিকে তিনি পরিষেবাক্ষেত্রে বেশি জোর দিয়েছেন জোগানের শৃঙ্খলকে জোরদার করার জন্য। ফলে অর্থনীতির নিয়মানুযায়ী দেশের উন্নতির হার ধরে রাখা বা বাড়ানো যাবে এবং বেকারত্ব ও দারিদ্র্য আরও কমে যাবে। সেজন্য এই বাজেটে মূল লক্ষ্য হলো : ১. আর্থিক উন্নতির হার বৃদ্ধি করা, ২. অর্থনৈতিক পরিকাঠামোর উন্নতি করা যাতে দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়, ৩. কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা, ৪. ফিসক্যাল ব্যালান্স রক্ষা করা, ৫. সামাজিক ক্ষেত্রগুলির উন্নতিতে বেশি জোর দেওয়া।

এখন এই বাজেটে ক্ষেত্রগত অবস্থান বিশ্লেষণ করা যাক। প্রথমে কৃষিক্ষেত্রকে ধরা যাক। কৃষকদের আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য শস্য চাষের ধরন পালটে অর্থকরী ফসল চাষের দিকে জোর দেওয়া হয়েছে এবং

এই বাজেটে অর্থমন্ত্রী দেশের আর্থিক উন্নতির হার ধরে রাখার জন্য ক্ষেত্রগত allocation-এর ভারসাম্য বজায় রেখেছেন ফিসক্যাল পুনর্বিন্যস্তকরণে একটা নির্দিষ্ট মান বজায় রেখেছেন। ভারতে সবকা সাথ, সবকা বিকাশ ও বিকশিত ভারতের লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য এই বাজেটে সবরকম চেষ্টা তিনি করেছেন।

এক্ষেত্রে কৃষকদের বেশি সাহায্য দেওয়া হবে। কৃষকদের আয় বাড়ানোর জন্য নতুন নতুন প্রকল্প আনা হয়েছে। সবকা সাথ, সবকা বিকাশের লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য এবং কৃষকদের আয় বাড়ানোর জন্য ভারত-বিস্তার প্রকল্প আনা হয়েছে। কৃষিতে বিভিন্ন ধরনের প্যাকেজ চালু করা হবে যাতে কৃত্রিম মেধা ব্যবহার করা যায়। পশুপালনের জন্য ঋণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কৃষকদের মানসিক স্বাস্থ্য উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও বায়োফার্মের জন্য ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। মৎস্যজীবীদের বিশেষ ঋণের ব্যবস্থা।

অন্যদিকে ম্যানুফ্যাক্চারিং শিল্পে জোর দেওয়া হয়েছে। জুট, টেক্সটাইল, হ্যান্ডলুম প্রভৃতি ক্ষেত্রে জোর দেওয়া হয়েছে। এই শিল্পগুলিতে শ্রমনিবিড় উৎপাদন কৌশলের বেশি প্রয়োগ হয়। ফলে একদিকে যেমন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে অন্যদিকে মানুষের আয়ও বাড়বে। ফলত, অভ্যন্তরীণ মোট চাহিদা বাড়বে। এছাড়া কর্মসংস্থান বাড়াবার জন্য MSME ও SME-তে বেশি করে জোর দেওয়া হয়েছে। MSME-তে ৭ লক্ষ কোটি টাকা ও SME ১০ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। দুর্গাপুর ইস্টকোস্ট শিল্প করিডর তৈরি হবে।

শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে উন্নতির জন্য নানা প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। যেমন দেশে ৫টি ইউনিভার্সিটি টাউনশিপ তৈরি হলেও ১৬ হাজার সেকেন্ডারি স্কুল নতুন করে তৈরি হবে। স্বাস্থ্যক্ষেত্রের উন্নতির জন্য ৫টি মেডিক্যাল টাউনশিপ হাব ও ৩টি আয়ুর্বেদিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরি হবে। সমস্ত জেলায় গার্লস হোস্টেল তৈরি হবে।

দেশজুড়ে পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য অনেক প্রকল্প আনা হয়েছে। যেমন ডানকুনিতে নতুন রেল প্রকল্প, ডানকুনি থেকে সুরাট ফ্রেট করিডোর তৈরি হবে; ২২টি নতুন জলপথ তৈরি হবে প্রভৃতি এর জন্য ১২ লক্ষ ২০ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। এছাড়াও বারাণসী-শিলিগুড়ি High-speed Rail Corridor-সহ দেশজুড়ে মোট সাতটি নতুন হাই-স্পিড রেল করিডোর হবে।

এর পাশাপাশি বৈদেশিক ক্ষেত্রে রপ্তানি বাড়াবার জন্য বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। এআই প্রয়োগের ক্ষেত্রে জোর দেওয়া হয়েছে। এছাড়া নিরাপদ আইটি হাবের জন্য বরাদ্দ ৩০০ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে বরাদ্দের ঊর্ধ্বসীমা ২ হাজার কোটি টাকা করা হয়েছে।

সামগ্রিক বিশ্লেষণ করলে দেখা যাচ্ছে, এই বাজেটে অর্থমন্ত্রী দেশের আর্থিক উন্নতির হার ধরে রাখার জন্য ক্ষেত্রগত allocation-এর ভারসাম্য বজায় রেখেছেন ফিসক্যাল পুনর্বিন্যস্তকরণে একটা নির্দিষ্ট মান বজায় রেখেছেন। ভারতে সবকা সাথ, সবকা বিকাশ ও বিকশিত ভারতের লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য এই বাজেটে সবরকম চেষ্টা তিনি করেছেন।

(লেখক অবসরপ্রাপ্ত অর্থনীতির অধ্যাপক, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)

২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে ভারতের প্রতিরক্ষা বাজেট

সামরিক বাহিনীর আধুনিকীকরণ এবং প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতা অর্জনে সহায়ক হবে

কর্নেল (ড.) কুণাল ভট্টাচার্য

২০২৬-২৭ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে প্রতিরক্ষা খাতে রেকর্ড পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করেছে ভারতীয় অর্থ মন্ত্রক, যার পরিমাণ হলো ৭.৮৫ লক্ষ কোটি টাকা। বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণে যা হলো ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে প্রতিরক্ষা খাতে প্রস্তাবিত বাজেট অনুমোদন অপেক্ষা ১৫ শতাংশ বেশি। 'অপারেশন সিঁদুর' পরবর্তী পর্যায়ে ভারতীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে প্রতিরক্ষা খাতে রেকর্ড পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। গত ১ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ বাজেট পেশের পর প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংহ বলেন যে, অপারেশন সিঁদুরের ঐতিহাসিক সাফল্যের প্রেক্ষাপটে প্রতিরক্ষা বরাদ্দ বৃদ্ধি ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে মজবুত করার সংকল্পকে আরও শক্তিশালী করেছে।

আধুনিকীকরণ, গবেষণা ও উন্নয়ন (আর অ্যান্ড ডি)-এর মাধ্যমে বৈরীমনোভাবাপন্ন প্রতিবেশীদের মোকাবিলায় ভারতের বিশাল প্রতিরক্ষা প্রস্তুতি : অপারেশন সিঁদুরের পর থেকে দ্রুত শক্তিশালী হয়ে ওঠার এক নতুন পর্যায়ে প্রবেশ করেছে ভারতীয় সামরিক বাহিনী। একই সময়ে চীন, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ একযোগে তাদের সামরিক কেনাকাটা বাড়িয়ে দিয়েছে। গত বছরের বাজেটে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে মূলধনী ব্যয় (ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার)-এর প্রতি অধিক গুরুত্ব দিয়ে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে একটি দিশাগত পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল। ভূ-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিপদের সম্ভাবনা ক্রমবর্ধমান। এমতাবস্থায় প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টির এই ধারা এই অর্থবর্ষেও অব্যাহত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।

প্রতিরক্ষা বাহিনীর আধুনিকীকরণের জন্য ২০২৬ সালের প্রতিরক্ষা বাজেটে বরাদ্দ কত?

দেশের সামরিক সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতাকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে প্রতিরক্ষা বাহিনীর আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে ভারতীয় সামরিক বাহিনীর জন্য ২.১৯ লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, যা গত অর্থবর্ষের তুলনায় ২১.৮৪ শতাংশ বেশি। এই আর্থিক বছরে মূলধনী ব্যয় বরাদ্দ (বা ক্যাপিটাল আউট-লে) হলো ১.৮ লক্ষ কোটি টাকা। মূলধনী বরাদ্দের মধ্যে ৬৩,৭৩৩ কোটি টাকা রাখা হয়েছে রাফাল ফাইটার জেট, সাবমেরিন ও চালকবিহীন ড্রোন বা ইউএভি-র জন্য। এটি চীন ও পাকিস্তানের থেকে প্রত্যাশিত বিপদ এবং আঞ্চলিক নিরাপত্তা বিষয়ক চ্যালেঞ্জ

মোকাবিলায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নেতৃত্বাধীন সরকারের দৃঢ় অঙ্গীকারেরই প্রতিফলন। আধুনিকীকরণের এই প্রয়াসকে প্রতিরক্ষা উৎপাদনে 'আত্মনির্ভরতা' অর্জন এবং প্রতিরক্ষা গবেষণা ও উন্নয়নে বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় নীতির ধারাবাহিকতা হিসেবেই দেখছে বিশেষজ্ঞ মহল।

প্রতিরক্ষা পরিষেবার জন্য রাজস্ব ব্যয় (রেভিনিউ এক্সপেন্ডিচার) বরাদ্দ : প্রতিরক্ষা বাহিনী ও প্রতিরক্ষা সরঞ্জামের রক্ষণাবেক্ষণ, গোলাবারুদ, জ্বালানি এবং বিভিন্ন প্রতিরক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সাজসরঞ্জামের মেরামত-সহ বিভিন্ন নিত্যনৈমিত্তিক কার্যক্রম এবং প্রতিরক্ষা কর্মীদের বেতনের জন্য নির্ধারিত প্রতিরক্ষা বাজেটের অংশটি ২০২৬-২৭ আর্থিক বছরে ১৭.২৪ শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়েছে। পেনশন ও অবসরকালীন প্রাপ্য প্রদানের জন্য আর্থিক বরাদ্দ এবার ৬.৫৩ শতাংশ বাড়িয়ে ১.৭১ লক্ষ কোটি টাকা করা হয়েছে।

মূলধনী ব্যয় বরাদ্দ : স্থল, নৌ ও বায়ুসেনার সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সামরিক বাহিনীর আধুনিকীকরণের জন্য গত আর্থিক বছরের সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ এবার ২১.৮৪ শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়েছে। এই খাতে গত অর্থবর্ষের সংশোধিত ব্যয় বরাদ্দ ছিল ১.৮৬ লক্ষ কোটি টাকা। এই বছর ২১.৮৪ শতাংশ বেড়ে তা হয়েছে ২.১৯ লক্ষ কোটি, যা একটি উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি। অপারেশন সিঁদুর পরবর্তী অধ্যায়ে বর্তমান ভূ-কৌশলগত অনিশ্চয়তার প্রেক্ষাপটে এই উচ্চতর প্রতিরক্ষা বরাদ্দ ছিল অতীব প্রত্যাশিত ও প্রয়োজনীয়।

মূলধনী বরাদ্দের মধ্যে বিমান ও এয়ারো-ইঞ্জিনের জন্য ৬৩,৭৩৩ কোটি টাকা এবং নৌবহরের জন্য ২৫,০২৩ কোটি টাকা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। গোলাবারুদ, জ্বালানি, প্রতিরক্ষা কর্মীদের বেতন এবং অন্যান্য অপারেশনাল প্রয়োজনের জন্য রাজস্ব ব্যয়বরাদ্দ হলো ৩.৬৫ লক্ষ কোটি টাকা। প্রতিরক্ষা পেনশনের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ হলো ১,৭১,৩৩৮.২২ কোটি টাকা, যা মোট প্রতিরক্ষা বাজেটের প্রায় ২১ শতাংশ।

২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে

মোট ব্যয় বরাদ্দের প্রায় ৬২.৫ শতাংশ হলো রাজস্ব ব্যয়। বাকি ৩৭.৫ শতাংশ রয়েছে আধুনিকীকরণের জন্য। সাইবার প্রযুক্তি, মহাকাশ গবেষণা, ড্রোন বিপ্লব, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ও মিসাইল (ক্ষেপণাস্ত্র) যুদ্ধের এই যুগে প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয়বরাদ্দ বৃদ্ধি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ভারতকে অবশ্যই প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে দেশীয় সক্ষমতার প্রতি জোর দিতে হবে। এর সঙ্গে প্রতিরক্ষা গবেষণায় বিনিয়োগও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, ভারতের উত্তর দিকের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী (চীন) কিন্তু আর্থিক দিক থেকে এবং প্রযুক্তিগতভাবে এখনও অনেক এগিয়ে।

অগ্নিবীরদের বেতন ও ভাতার জন্য বিশেষ বরাদ্দ : ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে 'অগ্নিবীর' প্রকল্পে প্রশিক্ষণরত ও কর্মরতদের বেতন, ভাতা ও প্রশিক্ষণের জন্য প্রতিরক্ষা বাজেটে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। যেহেতু এই বছর প্রথম ব্যাচের অগ্নিবীররা তাঁদের চার বছরের মেয়াদ শেষ করার কাছাকাছি পৌঁছাচ্ছেন, তাই তাঁদের 'সেবা নিধি' প্রকল্পের জন্য বাজেটে একটি আর্থিক প্যাকেজ রাখা হয়েছে।

এই আর্থিক বছরে ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যয়বরাদ্দ বাড়লেও অন্যান্য এশীয় দেশগুলিও কিন্তু প্রতিরক্ষা খাতে প্রচুর খরচ করছে। অপারেশন সিঁদুরের পর থেকে দ্রুত শক্তিশালী হয়ে ওঠার এক নতুন পর্যায়ে প্রবেশ করেছে ভারতীয় সামরিক বাহিনী। এরই সঙ্গে চীন, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ একযোগে তাদের সামরিক কেনাকাটাও বাড়িয়ে দিয়েছে।

ভারত সরকারের ২০২৬-২৭ অর্থ বাজেট অনুযায়ী রেকর্ড ৫৩.৫ লক্ষ কোটি টাকার রাজকোষ ঘাটতি কমিয়ে, রাজকোষ ঘাটতিকে জিডিপি-র ৪.৩ শতাংশে নামিয়ে আনা হয়েছে। তবে এখনও ভারতকে স্থায়ী সম্পদ, অর্থাৎ পরিকাঠামো নির্মাণ অপেক্ষা ঋণের সুদ মেটাতেই অধিক অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে। এই সময়ে দাঁড়িয়ে চীনের ক্রমবর্ধমান সামরিক শক্তি এবং পূর্ব এশিয়ার ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তন— বিভিন্ন দেশগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক এবং কৌশলগত (স্ট্র্যাটেজিক) চিন্তাধারা বদলে দিচ্ছে। ২০২৬-২৭ আর্থিক বছরে ইরানের চাবাহার বন্দর প্রকল্পের জন্য ভারত সরকার নতুন কোনো অর্থ বরাদ্দ করেনি। গত অর্থবর্ষ, অর্থাৎ ২০২৫-২৬-এর তুলনায় এটি একটি বড়ো পরিবর্তন, যেখানে এই প্রকল্পের জন্য সংশোধিত বরাদ্দ ছিল ৪০০ কোটি টাকা।

মার্কিন ডলারের অঙ্কে ভারতের মোট সামরিক ব্যয় ২০২০ সালের ৭৭.৪ বিলিয়ন ডলার থেকে বেড়ে ২০২৪ সালে দাঁড়িয়েছে ৮৩.৬ বিলিয়ন ডলার, যা প্রকৃত অর্থে ৮ শতাংশ বৃদ্ধি। এই আর্থিক বরাদ্দ বৃদ্ধি আপাতদৃষ্টিতে স্থিতিশীল মনে হলেও ২০১৬ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে প্রতিরক্ষা বাজেটে হওয়া ১৯ শতাংশ বৃদ্ধির তুলনায় তা কিঞ্চিৎ শ্লথগতি। অর্থনীতির বিভিন্ন মাপকাঠিতে পর্যবেক্ষণ করলে প্রতিরক্ষা খাতে প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ ব্যয়বরাদ্দ বাড়লেও প্রকৃতপক্ষে এক দশকেরও বেশি সময় ধরে মোট অর্থনীতির অংশ হিসেবে প্রতিরক্ষা ব্যয় কিন্তু সংকুচিত হচ্ছে। ২০০৯-১০ অর্থবর্ষে ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যয় ছিল জিডিপি-র ২.৮ শতাংশ, ২০২৪-২৫ সালে যা ১.৯ শতাংশে নেমে এসেছে। সুতরাং, মোট অর্থের পরিমাণে ভারত বর্তমানে অনেক বেশি খরচ করলেও, ক্রমবর্ধমান ভারতীয় অর্থনীতির অনুপাতে প্রতিরক্ষার অংশটি কিছুটা ছোটো হয়ে এসেছে। ভারতীয় অর্থ ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রক আগামীদিনে বিষয়টি নিশ্চয়ই বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করবে। □

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

কেন্দ্রীয় বাজেটে শিক্ষাক্ষেত্রে বরাদ্দ একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ

কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৬-২৭, একটি দূরদর্শী বাজেট। শিক্ষা, উদ্ভাবন, অন্তর্ভুক্তি ও কর্মসংস্থানকে সংযুক্তকারী বাজেট। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী কর্তৃক উপস্থাপিত ২০২৬-২৭ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে শিক্ষা সংক্রান্ত ঘোষণাগুলোকে অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘ (বিদ্যালয় শিক্ষা, পশ্চিমবঙ্গ) স্বাগত জানাচ্ছে। এই বাজেট শিক্ষাকে ডিগ্রি-কেন্দ্রিক কাঠামোর বাইরে নিয়ে গিয়ে গবেষণা, দক্ষতা, কর্মসংস্থান, নারী ক্ষমতায়ন ও উদ্ভাবনের সঙ্গে সংযুক্ত করেছে। শিক্ষা খাতের জন্য ১.৩৯ লক্ষ কোটি টাকার একটি ঐতিহাসিক বরাদ্দ করা হয়েছে। মহাসঙ্ঘের বিশ্বাস, এই ৮.২ শতাংশ বৃদ্ধি 'বিকশিত ভারত'-এর প্রতি সরকারের অঙ্গীকারকে দৃঢ়ভাবে শক্তিশালী করবে।

বর্তমান বাজেটে 'স্কুল শিক্ষার' জন্য ৮৩,৫৬২.২৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, যা গত বছরের তুলনায় ৬.৩৫ শতাংশ বেশি, এবং উচ্চশিক্ষার জন্য ৫৫,৫৬২.২৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, যা ১১.২৮ শতাংশের একটি উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি। গত পাঁচ বছরে কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা খাতে ব্যয় ২০২১ অর্থবছরের ৮৪,২১৯ কোটি টাকা থেকে বেড়ে চলতি বছরে ১.৩৯ লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছেছে, যা শিক্ষা খাতের প্রতি নীতিগত ধারাবাহিকতা এবং দীর্ঘমেয়াদি প্রতিশ্রুতি প্রদর্শন করে। মহাসঙ্ঘ এটিকে জাতীয় শিক্ষানীতি (এনইপি) ২০২০-এর উদ্দেশ্যগুলোর একটি পুনর্নিশ্চয়তা হিসেবে দেখছে।

১৫ হাজার মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং ৫০০ কলেজে এভিজিসি (অ্যানিমেশন, ভিজ্যুয়াল ইফেক্টস, গেমিং ও কমিকস) কন্টেন্ট ল্যাব স্থাপনের ঘোষণাটি যুবপ্রজন্মকে ডিজিটাল ও সৃজনশীল অর্থনীতির জন্য প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। প্রধান শিল্প ও লজিস্টিক করিডোরের কাছে পাঁচটি সমন্বিত বিশ্ববিদ্যালয় টাউনশিপ স্থাপনের প্রস্তাবটি শিক্ষা, গবেষণা, দক্ষতা ও শিল্পের মধ্যে সংযোগকে আরও শক্তিশালী করবে। একইভাবে, প্রতিটি জেলায় অন্তত একটি করে মেয়েদের হোস্টেল স্থাপনের সিদ্ধান্ত, যার জন্য প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে, তা উচ্চশিক্ষায় মহিলাদের অংশগ্রহণ, নিরাপত্তা ও ধারাবাহিকতা বাড়ানোর জন্য একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ।

বাজেটে চলতি বছরে ১০ হাজার নতুন মেডিক্যাল আসন চালুর প্রস্তাব করা হয়েছে এবং আগামী পাঁচ বছরে ৭৫ হাজার আসন যুক্ত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়াও তিনটি নতুন সর্বভারতীয় আয়ুর্বেদ প্রতিষ্ঠান স্থাপন, ১.৫ লক্ষ পরিচর্যাকারীকে প্রশিক্ষণ এবং ১০টি নতুন সহযোগী স্বাস্থ্য শাখা চালু করার মাধ্যমে স্বাস্থ্য শিক্ষা খাতে মানবসম্পদ উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। প্রস্তাবিত 'শিক্ষা থেকে কর্মসংস্থান ও উদ্যোগ স্থায়ী কমিটি' শিল্প, প্রযুক্তি, পরিষেবা এবং উদ্ভাবনের চাহিদার সঙ্গে পাঠ্যক্রমকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার মাধ্যমে শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের মধ্যে ব্যবধান পূরণে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

অখিল ভারতীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘ আশা করে যে, জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-এর কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য রাজ্য-স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো পরিকাঠামো উন্নয়ন, শিক্ষক পদ পূরণ, শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত সুবিধার জন্য পর্যাপ্ত কেন্দ্রীয় সহায়তা পাবে, যাতে জাতীয় শিক্ষানীতিকে তার প্রকৃত চেতনায় বাস্তবায়নের সম্মিলিত সংকল্প সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হতে পারে।

বাপি প্রামাণিক
সাধারণ সম্পাদক,
অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘ,
বিদ্যালয় শিক্ষা, পশ্চিমবঙ্গ,
২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬

পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের মুক্তি কবে?

অভাব— এই শব্দটি মানুষের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। অর্থের অভাব চোখে পড়ে, কিন্তু তার চেয়েও গভীর ও বিপজ্জনক সেই সব অভাব যা দৃশ্যমানতার আড়ালে লুকিয়ে থাকে— জ্ঞানের অভাব, চেতনার অভাব, শিক্ষার অভাব। আর পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপটে সবচেয়ে বড়ো এবং সবচেয়ে ভয়াবহ অভাব হিন্দুদের মধ্যে হিন্দুত্বের সংস্কারের অভাব।

এই অভাব যতদিন না কাটবে, ততদিন পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু সমাজের ভাগ্য বদলাবে না, এটাই নির্মম বাস্তব। ইতিহাস, সমাজ ও সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা একটাই কথা বলছে— চেতনা দুর্বল হলে সমাজ দুর্বল হয়, আর দুর্বল সমাজই অত্যাচারিত, নিপীড়িত ও বঞ্চিত হয়ে পড়ে। পশ্চিমবঙ্গে বারবার সেই ছবিই দেখা যাচ্ছে। প্রশ্ন একটাই— কেন?

কারণ স্পষ্ট। হিন্দুত্ব কেবল পরিচয়ের বিষয় নয়, এটি জীবনবোধ, সংস্কার ও সামাজিক সংহতির নাম। সেই সংস্কার দুর্বল হলে পরিবার দুর্বল হয়, পরিবার দুর্বল হলে সমাজ ভেঙে পড়ে। পশ্চিমবঙ্গে যে সামাজিক টানাপোড়েন, সাংস্কৃতিক সংকট ও আত্মবিশ্বাসের ঘাটতি— তার মূলে এই সংস্কারগত শূন্যতা। এই শূন্যতা পূরণ করতেই রাজ্যের কোনায় কোনায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে হিন্দু সম্মেলন। এই সম্মেলন কেবল মঞ্চ-সভা নয়; এগুলো চেতনার আলোকবর্তিকা, আত্মসম্মানের জাগরণ। বহু মানুষের অংশগ্রহণ প্রমাণ করছে— এই উদ্যোগ সফলতার মুখ দেখছে। কিন্তু সাফল্য মানেই কি কাজ শেষ? একেবারেই নয়।

আসল লড়াই ময়দানে নয়, ঘরের ভেতরে। হিন্দুত্বের সংস্কারকে যদি পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি বাড়ির অন্দরমহল বা তুলসীতলা পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া না যায়, তবে এই জাগরণ ক্ষণস্থায়ী হবে। বইয়ের পৃষ্ঠা নয়, জীবনের আচরণে; স্লোগানে নয়, সন্তানের শিক্ষায়; সভায় নয়, সংসারের সিদ্ধান্তে হিন্দুত্বের সংস্কারকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

এখন সময় এসেছে আবেগ নয়, আত্মসংস্কারের পথে হাঁটার। সংগঠনের পাশাপাশি সংস্কার, জমায়েতের পাশাপাশি জ্ঞান, মিছিলের পাশাপাশি মনন— এর সমন্বয়েই মুক্তির পথ। পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু সমাজ যদি এই অভাব কাটিয়ে উঠতে পারে, তবে আর কেউ তাদের বঞ্চিত করতে পারবে না। নইলে ইতিহাস বারবার একই প্রশ্ন ছুড়ে দেবে, অভাব বুঝেও কেন বদলাল না?

—কুন্তল চক্রবর্তী,
কলেজরোড, বনগাঁ, উ: ২৪ পরগনা।

মমতা ব্যানার্জি একজন সত্যিকারের বঙ্গ-বিরোধী নেত্রী

শুধু মুখে বিজেপিকে ও নরেন্দ্র মোদীকে বঙ্গবিরোধী বলে নিজেকে বঙ্গবন্ধু বা বাঙ্গালির বন্ধু বানানো যায় না। তার জন্য লাগে মন ও মেধা। যার কোনোটাই মমতা ব্যানার্জির নেই। নেই কোনো সদিচ্ছা। যা আছে তা ঠিক মতো দেখলেই নিজের ঢাক নিজে পেটানোর মতো ঠিক মনে হবে। আমরা যারা সনাতনধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল তারা অপরের মুখে অন্ন তুলে দেওয়ায় বিশ্বাসী। মমতা ব্যানার্জি বা তার দলের দিকে তাকালে তা কখনোই মনে হবে না। মমতা ব্যানার্জি যদি সত্যিই বাঙ্গালি প্রেমী হতেন তাহলে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের চোখের জলের মর্যাদা দিতেন। ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্টে এই কলকাতায় একদিনে ১০ হাজারের বেশি বাঙ্গালি হিন্দুকে সইদ সুরাবর্দির চক্রান্তে উন্মত্ত মুসলিম লিগ হত্যা করেছিল গুন্ডারা মমতা ব্যানার্জিকে কি কখনো তার উল্লেখ করতে বা স্মরণ করতে দেখেছেন? না দেখেননি। তাহলে?

যদি কোনো দরিদ্র পিতার সন্তান প্রকৃত মানুষ হয়ে বাড়ি-ঘর বানান আর তখন যদি তার বাবা-মা না থাকেন তাহলে সেই সন্তান আফশোস করেন। যাদের রক্তের বিনিময়ে সেই পশ্চিমবঙ্গের জন্ম, এই পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হয়ে মমতা কি কোনোদিন তাঁদের স্মরণ করেছেন? ২০ জুন, ১৯৪৭ সালে পশ্চিমবঙ্গের জন্ম। মমতা ব্যানার্জি ইচ্ছাকৃতভাবে সেই জন্মদিনটাকেই ভুলিয়ে দিয়ে ১ বৈশাখকে পশ্চিমবঙ্গের জন্মদিন বলে বিধানসভায় ঘোষণা করেছেন। কীসের তাগিদে, কাদের প্রতি ভালোবাসায় মমতা ব্যানার্জি এই কাজ করেছেন? যার কাছে হিন্দু বাঙ্গালির হত্যা ও রক্তের দান নেই তার বাঙ্গালি প্রেম যে ঠুনকো তা বুঝতে কি কোনো অসুবিধা আছে?

তিনি মোটেই পশ্চিমবঙ্গ ও বাঙ্গালির বন্ধু নন। আসলে তিনি মুসলমান প্রেমী স্বার্থপর মহিলা। তার পরিবারের সেদিন আর বর্তমানের এই বিস্তর ফারাক সেটা কি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে না? তার পরিবার করবে বৃহৎ ব্যবসা। করবে বিলাসবহুল জীবনযাপন। আর আমার-আপনার শিক্ষিত ছেলে-মেয়েরা বেচবে ঘুগনি, তেলেভাজা? এর নাম বাঙ্গালি প্রেম? তাঁর বিশাল পরিবারের কেউ কি বেচছে ঘুগনি- তেলেভাজা?

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন বাংলায় এমএ ক্লাস শুরু হয়, ব্রিটিশ ভারতে ঠিক মতো ছাত্র পাওয়া না গেলে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি তখন বাংলা নিয়ে এমএ পড়া শুরু করেন। এই ভাবেই বাংলায় এমএ পড়াকে জনপ্রিয় করেন। ভেবে দেখুন, আজ কেন মমতা বিজেপিকে বাঙ্গালি বিরোধী

বলছেন? বিজেপি সর্বদা ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জীবনাদর্শ মেনে চলে। আর একথা সত্য যে, তারা নাকি বাংলা বিরোধী? এ যেন চোর কোতয়ালকে ডাটে। আধুনিক সময়ে মমতা ব্যানার্জি একজন সত্যিকারের বঙ্গবিরোধী, বাঙ্গালি বিরোধী নেত্রী।

—শ্যামল কুমার হাতি,
চাঁদমারি রোড, হাওড়া-৯।

দেশপ্রেমিক শেঠ রামদাসজী গুডাওয়ালে

শেঠ রামদাসজী গুডাওয়ালে একজন মহান বিপ্লবী ছিলেন। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের দাতা, ব্রিটিশরা তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার আগে জীবিত অবস্থায় তার শরীরে শিকারি কুকুর লেলিয়ে দিয়েছিল। শেঠ রামদাসজী গুডাওয়ালে ছিলেন দিল্লির একজন কোটিপতি ব্যবসায়ী ও ব্যাংকার। তিনি দিল্লির একটি আগরওয়াল পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিল। তার পরিবার দিল্লিতে প্রথম টেক্সটাইল মিল প্রতিষ্ঠা করেছিল। 'রামদাসজী গুডাওয়ালের প্রচুর সোনা-রুপার গয়না, তিনি তাঁর সঞ্চিত সোনা-রুপোর বাঁধ দিয়ে গঙ্গানদীর প্রবাহ বন্ধ করতে পারেন— 'তার সম্পদ সম্পর্কে এরকম প্রবাদ ছিল।

১৮৫৭ সালে যখন বিপ্লবের স্ফুলিঙ্গ মীরাট থেকে দিল্লিতে পৌঁছায়, দেশের দিল্লিতে ব্রিটিশদের পরাজিত করার পর, ভারতীয় সৈন্যরা দিল্লিতে চলে আসে। এর ফলে তাদের খাবার এবং বেতনের সমস্যা তৈরি হয়। রামদাসজী গুডাওয়ালের প্রিয়বন্ধু। রাজার হাতে কোটি কোটি টাকার সম্পদ তুলে দিয়ে, মাতৃভূমিকে রক্ষা করার সৈন্যদলের জন্য খাদ্য, পোশাক, আটা, শস্য, বলদ, উট ও ঘোড়াও সরবরাহ করেছিলেন।

সেই সময় ব্যবসায়ী শেঠজী সেনাবাহিনী এবং গোয়েন্দা বিভাগকেও সংগঠিত করতে শুরু করেছিলেন। এমনকী ব্রিটিশ জেনারেলরাও তার সংগঠনের শক্তি দেখে অবাক হয়েছিলেন। তিনি উত্তর ভারত জুড়ে একটি গুপ্তচর নেটওয়ার্ক প্রসারিত করেছিলেন, অসংখ্য সামরিক সেনানিবাসের সঙ্গে গোপন সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন।

তিনি ভেতর থেকে একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনী এবং গোয়েন্দা সংস্থা তৈরি করেছিলেন। তিনি দেশের প্রতিটি কোনে গুপ্তচর পাঠিয়েছিলেন এবং জনগণ ও রাজাদের এই সংকটে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দেশকে স্বাধীন করার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন।

ব্রিটিশ সরকার ও কর্মকর্তারা রামদাসজীর বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন ও ব্যথিত হয়েছিল। ব্রিটিশরা কোনো কারণে দিল্লি দখল করেছিল। একদিন চাঁদনী চকে দোকানের সামনে বিষাক্ত মদের বাক্স ছড়িয়ে ছিটিয়ে পাওয়া গিয়েছিল। ব্রিটিশ সেনাবাহিনী তা দিয়ে তাদের তৃষ্ণা মেটায় ও ঘুমিয়ে পড়ে। রামদাসজী বুঝতে পেরেছিলেন ব্রিটিশ শাসনকে শেষ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

যেভাবে রামদাসজী গুডওয়ালকে ধরে নিয়ে গিয়ে হত্যা করা হয়েছিল তা নিষ্ঠুরতার এক উদাহরণ। প্রথমে দড়ি দিয়ে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে, তারপর তাকে শিকারী কুকুর লেলিয়ে দিয়ে হত্যা করা হয় এবং তারপর দিল্লির চাঁদনী চকে থানার সামনে ঝুলিয়ে রাখা হয়। প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ তারাচাঁদ তার 'স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস' বইতে লিখেছেন, শেঠ রামদাস গুডওয়ালা উত্তর ভারতের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি ছিলেন। ব্রিটিশদের মতে, তিনি অসংখ্য মুক্তা, হীরারত্ন এবং বিশাল ধনসম্পদ সঞ্চয় করেছিলেন। শেঠ রামদাসের মতো অনেক বিপ্লবী ইতিহাসের পাতা থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছেন। শেঠ রামদাসের মতো বিপ্লবীদের বলিদানের ঋণ কেউ কী শোধ করতে পারবে না।

—দেবজ্যোতি পণ্ডিত,
কাঞ্চনতার, মালদা।

বালি হল্ট স্টেশনের সংস্কার প্রয়োজন

১৯৮৭ সালে বালি হল্ট স্টেশনের উদ্বোধনের পর থেকে এই স্টেশনের গুরুত্ব অপরিসীম হয়েছে নিত্যযাত্রীদের কাছে। এই স্টেশনটি রেলের দুই ডিভিশন— হাওড়া ও শিয়ালদহ ডিভিশনের সংযোগকারী স্টেশন। এই স্টেশনটির গুরুত্ব বেড়েছে অধিকাংশ সরকারি দপ্তরের ঠিকানা বদলে বিধাননগর হওয়ায়। হাওড়া ডিভিশনের হাজার হাজার যাত্রী এই লিংক স্টেশনটি ব্যবহার করে বিধাননগর তথা শিয়ালদহ ডিভিশনের বহু স্টেশনে যাতায়াত করেন। শিয়ালদহ- ডানকুনি সেকশনটি রেলপথে জুড়েছে বর্ধমান কর্ড সেকশনকেও।

এহেন গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন হওয়ার জন্য এই স্টেশনটির আপ প্লাটফর্মের সংস্কার জরুরি হয়ে পড়েছে। নাহলে ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবলে পড়তে পারেন যাত্রীরা। গত দুই বছরের ওপরে এই সেকশনে চলা ইএমইউ কোচের মেঝে এবং স্টেশনের উপরিতলের মধ্যে দূরত্ব প্রায় তিন ফুটের মতো। ফলে যাত্রীদের ট্রেন থেকে নামতে গেলে লাফিয়ে নামতে হয় এবং অনেক সময় তাড়াহুড়ো করে চলন্ত ট্রেনে ওঠা-নামার সময়ে ভয়াবহ দুর্ঘটনার শিকার হওয়াও অসম্ভব নয়। হল্ট স্টেশন হবার কারণে এই স্টেশনটির কোনো স্টেশন মাস্টারের কার্যালয় নেই। ফলে এই স্টেশনটির পরিচালনা হয় বালিঘাট স্টেশন থেকে। আমি ব্যক্তিগতভাবে বালিঘাট স্টেশন মাস্টারকে বার পাঁচেক মৌখিক এবং লিখিতভাবে অবহিত করেছি, কিন্তু বিষয়টি রেলের কর্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেই এই পত্র। আমাদের দেশে কোনো দুর্ঘটনা না ঘটলে কর্তৃপক্ষের টনক নড়ে না। যাত্রী স্বার্থে আমার এই আবেদন, কারণ আমিও এই পথের একজন নিত্যযাত্রী। আমাকেও লাফিয়ে ট্রেনে ওঠা-নামা করতে হয়।

—তারক সাহা,
হিন্দমোটর, হুগলি।

With Best Compliments from-

A

Well Wisher

ছাত্রজীবনে পড়াশোনা এবং মায়ের ভূমিকা

সুতপা বসাক ভড়

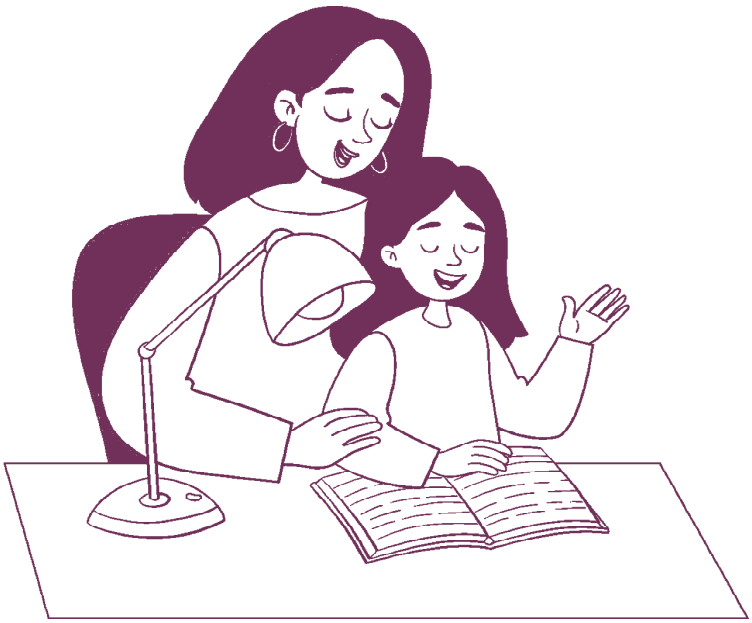

পূর্বজরা বলে গেছেন, 'ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ' অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের কাছে অধ্যয়নই একমাত্র তপস্যা হওয়া কাম্য। সফল হতে হলে মনুষ্যজীবনে শিক্ষার একটি অতুলনীয় ভূমিকা আছে। সে শিক্ষা হলো চরিত্রগঠন এবং পাঠ্যপুস্তক সম্পর্কিত। একসময় করোনাময় পরিস্থিতিতে বিদ্যালয়-কলেজ সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কার্যত বন্ধ ছিল। মোবাইল বা ল্যাপটপে পড়াশোনা চলছিল। আমরা সবাই জানি যে, এই দুটি যন্ত্রের যথার্থ ব্যবহার থেকে অপব্যবহার হয় অনেকগুণ বেশি। সুতরাং, যথাসময়ে আমরা যদি সতর্ক না হই, তাহলে আমাদের ছাত্রশক্তি— যা আমাদের রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ, তারা বিপথগামী হবে। এর মধ্যে আমরা প্রায় সবাই জেনেছি যে, এই অতিমারীটি প্রাকৃতিক নয়, বরং পূর্ব-পরিকল্পিত ও প্রয়োগশালায় হয়েছে এর সূচনা। আমাদের দেশের ক্ষতিসাধন এই পরিকল্পনার অন্যতম একটি অঙ্গ। সেজন্য আমাদের বিশেষত মায়েদের এই প্রসঙ্গে অতিমাত্রায় সচেতন থাকতে হবে। রক্ষা করতে হবে আমাদের সন্তান, পরিবার, সমাজ, দেশ তথা সমগ্র বিশ্বকে। অতি সম্প্রতি রাজ্য সরকার পরিচালিত বোর্ডের পরীক্ষার ফলাফলে প্রচুর নম্বর দিয়ে পাশ করিয়ে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের সন্তুষ্ট করার অভিযোগ উঠেছে। তাতে নম্বর তো অনেক এল, কিন্তু শিক্ষা? শিক্ষার প্রতিফলন নম্বরে নয়, যোগ্যতায়। জীবনে এরা কীভাবে সফল হবে? পুঁথিগত বিদ্যাই সবকিছু অবশ্যই নয়, কিন্তু কিছু শিক্ষা তো সেখান থেকে নিতেই হয়।

এই কঠিন পরিস্থিতি সামলাতে পারেন একমাত্র বাড়ির মায়েরা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি যেহেতু বন্ধ থাকল, তাঁরা অনায়াসে নিজেরাই শিক্ষকতার দায়িত্ব নিতে শিক্ষার্থীদের থেকে নিয়মিত পড়া নেবেন। বিশেষ করে তাদের উত্তর লেখার অভ্যেস করাতে হবে। শিক্ষার্থীরা যতক্ষণ পড়বে, তার সমপরিমাণ অথবা তার থেকেও বেশি সময় লিখে অভ্যাস করবে। বিভিন্নপ্রকার প্রশ্নাবলী পাঠ্যপুস্তক বা ইন্টারনেটে পাওয়া যায়, যা মায়ের নিজেরা খুঁজে খাতায় লিখে নিতে পারেন। যে সময় আমরা টিভি, হোয়াটস্ অ্যাপ, ইউটিউব নিয়ে ফোনে ব্যস্ত থাকি, সেখান থেকে একটু সময় নিজেদের সন্তানদের কল্যাণের জন্য অবশ্যই বের করে নিতে পারি। ওইসব প্রশ্নের উত্তর ছাত্র-ছাত্রীরা না দেখে লেখার চেষ্টা করবে। এর ফলে তাদের পড়াশোনার অনেক উন্নতি হবে। সমস্ত বিষয় এইভাবে অভ্যেস করাতে হবে। ছবি এঁকে (বিজ্ঞান, ভূগোল), ফরমূলা (বিজ্ঞান-অঙ্ক) ইত্যাদি খাতায় লিখে ব্যাপক অভ্যাসের প্রয়োজন। এমনকী, হাতের লেখা সুন্দর এবং পরিচ্ছন্ন করার দিকেও দৃষ্টি দিতে হবে।

করোনার জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যাতায়াতের সময় অনেকটা সাশ্রয় হয়েছিল। সেইসময় শিক্ষার্থীরা অনায়াসেই সদ্ব্যবহার করতে পারে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, বিভিন্ন ব্যবসায়িক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি শিক্ষার নামে রমরম করে ব্যবসা করছে। আমরা প্রায়শই নিজেদের অজান্তে তাদের ফাঁদে পড়ি। অর্থ, সময়, সন্তানের সুকোমল সত্তার বিনিময়ে তাদের ফাঁদে অনাবশ্যক টেনশন নিয়ে থাকি। অন-লাইন ক্লাশ হলো— 'স্বর্ণমৃগ', এর লক্ষ্য স্থির করে ওই ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলি। তার পর অভিভাবকদের মগজধোলাই। মোটা অঙ্কের অর্থ দিয়ে সন্তানদের ধরে-বেঁধে তাদের খোঁয়াড়ে ঢুকিয়ে মানসিক চাপের মধ্যে ফেলেন। হাঁফিয়ে উঠে শিক্ষার্থীরা, তখন অন-লাইনের হাত ধরে নেট-দুনিয়ার কালো গহ্বরে তলিয়ে যেতে থাকে। পরে, ভালো নম্বর পেলেও চরিত্র গঠনের ব্যাপারটা শূন্য বা তার থেকেও কম হয়ে যায়। আচ্ছা, আমাদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ কি ওই ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলি ঠিক করে দেবে? সমাজ তাদের থেকে কী পায়? কৃতী ছাত্র-ছাত্রী? যারা নিজেদের মা-বাবাকে ছেড়ে, নিজের দেশকে ছেড়ে অন্য দেশে পাড়ি দেয়। এই কি লক্ষ্য? এই জন্যই কি আমরা আমাদের সন্তানদের প্রতিপালন করি?

অমোঘ সত্য হলো— মা সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক। সুতরাং, আমাদের সন্তানদের মঙ্গল কীসে হবে, তা আমাদের থেকে ভালো আর কেউ কীভাবে জানবে? সন্তানের সঙ্গে পড়াশোনার মাধ্যমে যুক্ত থাকলে, মা ও সন্তানের মধ্যে একটি সুন্দর বন্ধন তৈরি হয়--- যা আজীবন থাকে। মানসিকভাবে পরস্পর পরস্পরের অনেক কাছে থাকে। এই তো আমাদের মূল উদ্দেশ্য। যে শিক্ষা আমাদের প্রকৃত মানুষরূপে গড়ে তোলে, সেই তো প্রকৃত শিক্ষা— সে শিক্ষা দেন মা!

□

শশা অত্যন্ত পুষ্টিকর

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

বিভিন্ন প্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থ ও ভিটামিনের একটি চমৎকার উৎস শশা। ভিটামিন-কে রক্ত জমাট বাঁধার জন্য অপরিহার্য এবং এই ভিটামিন হাড়ের গঠন মজবুত করে। ভিটামিন সি কোলাজেন সংশ্লেষণে সাহায্য করে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। উপরন্তু শশা পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম ও ম্যাঙ্গানিজের মতো খনিজ সরবরাহ করে, যা সঠিক শারীরিক ক্রিয়াকলাপ বজায় রাখার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

হাইড্রেশন ও ডিটক্সিফিকেশন : শশায় প্রায় ৯৬ শতাংশ জল থাকে, যার ফলে এটি একটি চমৎকার হাইড্রেটিং খাবার। হজম, বিপাক এবং তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ-সহ বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়াকলাপের জন্য ভালো-হাইড্রেটর থাকা অত্যাবশ্যক। অধিকন্তু শশা একটি প্রাকৃতিক মূত্রবর্ধক হিসেবে কাজ করে, শরীর থেকে বিষাক্ত পদার্থ দূর করতে এবং কিডনির কার্যকারিতা বাড়াতে সহায়তা করে।

শশাতে ফ্ল্যাভোনয়েড ও ট্যানিন-সহ বেশ কয়েকটি অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে যা বিভিন্ন দীর্ঘস্থায়ী রোগের সম্ভাবনা হ্রাস করে, যেমন কার্ডিওভাসকুলার ডিজঅর্ডার এবং কিছু কিছু ক্যানসার ধরনের। উপরন্তু শশাতে রয়েছে কিউকারবিটাসিন, শক্তিশালী যৌগগুলির একটি গ্রুপ যা প্রদাহ বিরোধী এবং অ্যান্টিক্যানসার বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করে।

শশার ১২টি উপকারিতা হলো :

● **হাইড্রেশন এবং ওয়েট ম্যানেজমেন্ট :** 'স্বাস্থ্যের জন্য শশা' একটি প্রাচীন প্রবাদ। শশার উচ্চ জল শতাংশ এবং কম ক্যালোরি গণনার কারণে, হাইড্রেটেড থাকার জন্য এবং ওজন নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করার জন্য একটি চমৎকার ফল।

● **হজমশক্তি বাড়ায় :** শশায় প্রচুর পরিমাণে ডায়েটারি ফাইবার রয়েছে, যা স্বাস্থ্যকর এবং হজমকে ত্বরান্বিত করে। ফাইবার থাকার জন্য কোষ্ঠকাঠিন্য রোধ করে এবং নিয়মিত মলত্যাগে সহায়তা করে। খাদ্যতালিকায় শশা রাখা খুবই স্বাস্থ্যকর।

● **ত্বকের স্বাস্থ্য :** শশার উচ্চ জলীয় উপাদান এবং শীতল বৈশিষ্ট্য ত্বকের স্বাস্থ্য বর্ধন করে, শশার টুকরো বা শশা-মিশ্রিত খাবার কড়া রোদে পোড়া ভাব প্রশমিত করতে পারে, ফোলাভাব কমাতে পারে এবং ত্বককে হাইড্রেট করতে পারে। উপরন্তু শশাতে উপস্থিত অ্যান্টিঅক্সিডেন্টগুলি ত্বকের বার্ধক্যের বিরুদ্ধে লড়াই করতে এবং তারুণ্যের চেহারা বজায় রাখতে সহায়তা করে।

● **হাড়ের স্বাস্থ্য :** শশাতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন-কে থাকে, যা হাড়ের স্বাস্থ্যের জন্য অত্যাবশ্যক। পর্যাপ্ত ভিটামিন-কে গ্রহণ ক্যালসিয়াম শোষণ উন্নত করতে সাহায্য করে, ফ্র্যাকচার ও অস্টিওপোরোসিসের সম্ভাবনা কমায়। তাই মজবুত ও সুস্থ হাড়ের জন্য খাদ্যতালিকায় শশা রাখা জরুরি।

● **হার্টের স্বাস্থ্য :** শশাতে পটাশিয়াম থাকে, যা রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে এবং কার্ডিওভাসকুলার রোগের ঝুঁকি কমায়। উপরন্তু শশায় উদ্ভিদ যৌগ কিউকারবিটাসিনের প্রদাহ-বিরোধী প্রভাব রয়েছে, যা হৃদরোগের সম্ভাবনা কম করে।

● **ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ :** শশার গ্লাইসেমিক সূচক কম, যার কারণে এই ফল ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য খুবই উপকারী তোলে। শশায় থাকা ফাইবার উপাদান হজম প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে, রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। ডায়াবেটিক ডায়েটে শশা অন্তর্ভুক্ত করা খুবই প্রয়োজন।

● **চোখের মঙ্গল :** শশায় রয়েছে বিভিন্ন অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, যেমন বিটা-ক্যারোটিন এবং লিউটিন, যা চোখের জন্য উপকারী। এই অ্যান্টিঅক্সিডেন্টগুলি ফ্রি র‍্যাডিক্যালগুলি সঞ্চালনের কারণে সৃষ্ট ক্ষতি থেকে চোখকে রক্ষা করতে সহায়তা করে এবং বয়স-জনিত ম্যাকুলার অবক্ষয় ও ছানি পড়ার সম্ভাবনা হ্রাস করে।

● **অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি বৈশিষ্ট্য :** শশাতে কিউকারবিটাসিনের উপস্থিতি তাদের শক্তিশালী অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি বৈশিষ্ট্য দেয়। শশা নিয়মিত সেবন শরীরের প্রদাহ কমাতে সাহায্য করতে পারে, বিভিন্ন অবস্থার উপসর্গ যেমন আর্থ্রাইটিস এবং হাঁপানি দূর করতে সাহায্য করতে পারে।

● **ক্যানসার প্রতিরোধ :** শশায় বিভিন্ন যৌগ রয়েছে, যেমন কিউকারবিটাসিন এবং লিগন্যান, যা ক্যানসার প্রতিরোধী বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এই যৌগগুলি ক্যানসার কোষের বৃদ্ধিকে বাধা দেয় এবং স্তন, জরায়ু ও প্রোস্টেট ক্যানসার-সহ নির্দিষ্ট ধরনের ক্যানসারের সম্ভাবনা কমায়।

● **মস্তিষ্কের স্বাস্থ্য :** শশায় উপস্থিত ফ্ল্যাভোনয়েডগুলি মস্তিষ্কের কার্যকারিতা বাড়ায় এবং সম্ভাবনা কমিয়ে দেয় স্নায়ুজনিত রোগ, যেমন অ্যালঝাইমার রোগ। খাদ্য তালিকায় শশা অন্তর্ভুক্ত করা সুস্থ মস্তিষ্ক বজায় রাখতে সহায়ক।

● **মুখাভ্যন্তরের স্বাস্থ্য :** শশা চিবানো লালা উৎপাদনকে উদ্দীপিত করে, যা মুখের অ্যাসিডিটিকে নিরপেক্ষ করতে এবং দাঁতের ক্ষয় রোধ করতে সহায়তা করে। উপরন্তু, শশার উচ্চ জলীয় অংশ মুখকে হাইড্রেটেড রাখতে সাহায্য করে এবং শুষ্ক মুখের ঝুঁকি কমায়। নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ দূর করে। মুখের মধ্যে উপস্থিত ব্যাকটেরিয়া নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ বা হ্যালিটোসিসের কারণ হতে পারে। শশায় ফাইটোকেমিক্যাল রয়েছে যা অপ্রীতিকর গন্ধের জন্য দায়ী ব্যাকটেরিয়াকে মেরে ফেলে নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সাহায্য করতে পারে। □

সঙ্ঘ শতবর্ষ উপলক্ষ্যে বর্ধমানে বিশিষ্ট নাগরিক সম্মেলন

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের শতবর্ষ উপলক্ষ্যে গত ১৯ জানুয়ারি বর্ধমান শহরের রেলওয়ে ইনস্টিটিউট হলে বিশিষ্ট নাগরিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। প্রধান বক্তারূপে উপস্থিত ছিলেন সঙ্ঘের সরকার্যবাহ দত্তাত্রেয় হোসবলে। উপস্থিত ছিলেন মধ্যবঙ্গ প্রান্ত সঙ্ঘচালক রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সভাকক্ষে বর্ধমানের বিশিষ্ট মানুষদের সঙ্গে সঙ্ঘের বিশিষ্ট কার্যকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন। বিকেল ৩টায় প্রদীপ প্রজ্বলন করে ভারতমাতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন সরকার্যবাহ মহোদয় এবং প্রান্ত সঙ্ঘচালক মহাশয়।

সম্পূর্ণ অনুষ্ঠান দু'ভাগে সম্পন্ন হয়। প্রথম পর্বের সূচনায় পরিপূর্ণ সভাকক্ষে কয়েকটি দেশাত্মবোধক সঙ্গীত পরিবেশন করেন সংস্কার ভারতী, বর্ধমান শাখার শিল্পীরা। তারপরেই সঙ্ঘের শতবর্ষের যাত্রা এবং সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সঙ্ঘের ইতিবাচক ভূমিকার বিষয়ে আলোকপাত করেন সরকার্যবাহ মহোদয়। দ্বিতীয়

পর্বে উপস্থিত বিশিষ্টজনদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন তিনি। সমগ্র অনুষ্ঠান সুচারুরূপে সঞ্চালনা করেন দেবনাথ মল্লিক এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বর্ধমান জেলা সঙ্ঘচালক তুষারকান্তি হাজরা।

মধ্যমগ্রামে বিবেক চিন্তন ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে বিবেক মেলা

স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তা, চেতনা ও আদর্শকে পাথেয় করে মধ্যমগ্রামে বিবেক চিন্তন ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে গত ৭ থেকে ১২ জানুয়ারি 'বিবেক মেলা'র আয়োজন করা হয়। তিনদিন আগে বিবেক যাত্রা নামে এক শোভাযাত্রার মাধ্যমে এলাকার মানুষের কাছে মেলার বার্তা পৌঁছে দেওয়া হয়। মেলার উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ডঃ সি ভি আনন্দ বোস। উপস্থিত ছিলেন মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইনস্টিটিউট অব এশিয়ান স্টাডিজ-এর ডিরেক্টর ড. সরূপপ্রসাদ ঘোষ, রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়, রহড়ার পরীক্ষা বিভাগের নিয়ামক স্বামী বেদানুরাগানন্দজী মহারাজ, ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন অ্যান্ড আউটরিচ, কলকাতার নিয়ামক ড. বেদাশিস কোলে, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ওপেন স্কুলিং-এর আঞ্চলিক পরিচালক চঞ্চল কুমার সিংহ, প্রণব কন্যা আশ্রম মধ্যমগ্রাম শাখার সম্পাদক পূজনীয়া বিশুদ্ধানন্দময়ী মাতাজী। ছিলেন বিবেক মেলা-২৬-এর সভাপতি পদ্মশ্রী ড. জগদীশ হালদার। সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁদের সবিশেষ অবদানের জন্য ৪জনকে 'বিবেক সম্মান' পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রবন্ধ রচনা, ক্যুইজ, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা, নৃত্য, সঙ্গীত, দাবাখেলা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, আবৃত্তি, অঙ্কন, স্বামীজীর বাণীপাঠ, রূপসজ্জা, যেমন খুশি সাজো, সৃজনশীল হস্তশিল্প, যোগাসন প্রভৃতির আয়োজন করা হয়।

সঙ্ঘ শতবর্ষ উপলক্ষ্যে গত ২৫ জানুয়ারি বীরভূম জেলার রামপুরহাটে হিন্দু সম্মেলন। অনুষ্ঠিত হয় শান্তিযজ্ঞ। সাধুসন্ত-সহ দশহাজার মানুষ অংশগ্রহণ করেন এবং প্রসাদ গ্রহণ করেন। উপস্থিত ছিলেন আয়োজন সমিতির সম্পাদক চরণ দাস, সভাপতি প্রভাত কুমার ঘোষ-সহ গৌতম নিয়োগী, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অনির্বাণ সরকার, পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়, লব মণ্ডল প্রমুখ।

গত ২৬ জানুয়ারি মালদা নগরের ২৮ নং ওয়ার্ডে হিন্দু সম্মেলন। ভাষণ দেন বিজয় ঘোষ, যোগগুরু তপন দাস এবং শ্রীমতী রুম্পা দাস। অনুষ্ঠানে গীতাপাঠ ও ভজন কীর্তন হয়।

পরিবার প্রবোধন উত্তরবঙ্গ প্রান্ত সংযোজকের এক অনন্য প্রয়াস

পরিবার প্রবোধন উত্তরবঙ্গ প্রান্ত সংযোজক রামেশ্বর পাল একটি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক। তাঁর পৈতৃক বাড়ি মালদা জেলার নালাগোলার কাছে মথুরাডাঙ্গা গ্রাম। গত ২৫ জানুয়ারি তাঁর উদ্যোগে কর্মসূত্রে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা তাঁর ৬ ভাই, ১ বোন সপরিবারে গ্রামের বাড়িতে একত্রিত হন। শুধু তাই নয়, তাঁদের পরিবারের পুত্র-কন্যা যারা কর্মসূত্রে বা বিবাহসূত্রে বিভিন্ন জায়গায় থাকেন তারাও এই পারিবারিক মিলনে অংশগ্রহণ করেন।

পরিবারের ছোটো ভাই পূর্ব বিদ্যার্থী বিস্তারক বিবেকানন্দ পাল দুর্গাপুর থেকে সপরিবার শাশুড়ি-সহ, রায়গঞ্জ সারদা বিদ্যামন্দিরের অধ্যক্ষ তথা সঙ্ঘের পূর্ব প্রচারক রাজবলী পাল সপরিবারে, স্বয়ং রামেশ্বর পাল মালদা শহরে থেকে, পরিবারের অগ্রজ তথা গ্রামের প্রথম স্বয়ংসেবক, অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক ভগবানরাম পাল, প্রতিষ্ঠিত আমিন ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক রামদয়াল পাল, দক্ষ চাষি রামপ্রভাস পাল এবং একমাত্র বোন সাবিত্রী সপরিবারে মোট ৭০ জন এই পরিবার মিলনে অংশগ্রহণ করেন। অতিথিরূপে এই পরিবারের সকলের প্রিয় ভূপেশচন্দ্র বর্মন মালদা নগর থেকে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি পরিবারের ছোটো-বড়ো সকলকে নিয়ে বিভিন্ন খেলা পরিচালনা করেন,যা সকলেই উপভোগ করেন। উপস্থিত ছিলেন সঙ্ঘের মালদা জেলা সঙ্ঘচালক নির্মল কুমার নাথ। তিনি বলেন, এরকম পরিবার মিলন অনুষ্ঠান প্রতিটি পারিবারে খুব প্রয়োজন। দুপুরে সকলেই সহভোজে অংশগ্রহণ করেন।

ক্রীড়া ভারতীর উদ্যোগে, দীপঙ্কর পোড়েলের ব্যবস্থাপনায় এবং আমতা গাজীপুর পঞ্চানন সঙ্ঘের সহযোগিতায় মহিলা কাবাডি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। মোট ৮টি দল অংশগ্রহণ করে। বিভিন্ন সামাজিক সংস্থার কর্মকর্তা, স্থানীয় থানার আধিকারিক এবং ক্রীড়া ভারতীর পক্ষে উপস্থিত ছিলেন শুভেন্দু সরকার।

Today's Choice.....
Vandana
SAREES • SUITS • BEDSHEETS
Mfg. of Cotton Printed & Embroidory Sarees & Bedsheets (Always Exclusive)
Cont. No. 033-2270 0476, 9432290475

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বিষয়ক আলোচনাসভা

গত ২৩-২৬ জানুয়ারি জাতীয় আর্তত্রাণ সমিতির উদ্যোগে মধ্য কলকাতা স্থিত মলঙ্গা লেনের সন্নিকটে ত্রিকোণ পার্কে উদ্‌যাপিত হয় নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর ১৩০তম জন্মদিবস। ২৩ জানুয়ারি সকাল ১০টায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং সম্মিলিত কণ্ঠে বন্দে মাতরম্ সংগীতের মধ্যে দিয়ে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জন্মদিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানের সূত্রপাত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিশিষ্ট অতিথিরা নেতাজীর মূর্তিতে মাল্যদান করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেন। দুপুর ১২টা ১৫ মিনিটে নেতাজীর জন্মমুহূর্তে ফায়ারিং স্যালুট-সহ সাইরেন বাজানো হয়। জাতীয় আর্তত্রাণ সমিতির ব্যান্ডের দ্বারা ধ্বনিত হয় নানা দেশাত্মবোধক সংগীত। সমিতির প্রতিষ্ঠাতার বিপ্লবী গোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিতে এদিন আয়োজিত হয় শিশুদের জন্য বসে আঁকো প্রতিযোগিতা। এরপর আয়োজিত হয় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। গত ২৫ জানুয়ারি ত্রিকোণ পার্কে সমিতির উদ্যোগে আয়োজিত হয় 'নেতাজী সুভাষচন্দ্র' বিষয়ক একটি আলোচনাসভা। সভায় বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মরমিয়া স্পিরিচুয়াল সোসাইটির কর্ণধার জয়দীপ মহারাজ, বিশিষ্ট আইনজীবী ও নেতাজী গবেষক কেশব ভট্টাচার্য্য, আলিপুর বার্তা পত্রিকার সম্পাদক ও বিশিষ্ট নেতাজী গবেষক ড. জয়ন্ত চৌধুরী এবং আইএনএ-র সেনানী সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র শুভেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মহাজীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা ছাড়াও তাঁর অন্তর্ধান রহস্যের বিষয়টিও এদিন বক্তাদের আলোচনায় উঠে আসে। সকলের বক্তব্যের শেষে সভায় উপস্থিত অন্যান্যদের সঙ্গে বক্তাদের প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। ২৬ জানুয়ারি সাধারণতন্ত্র দিবস উদ্‌যাপনের সঙ্গে বালক ভোজন ও আতশবাজির প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়।

গত ১৮ জানুয়ারি মহর্ষি দধীচি সেবা ট্রাস্টের অন্তর্গত শ্রীদাধীচ নবযুবক পরিষদের উদ্যোগে দাধীচ প্রিমিয়র লিগের আয়োজন করা হয়। তাতে প্রথমবারের ফাইনালে মুকেশ কাকড়ার মালিকানাধীন কাকড়া ডায়নামাইটস্ ক্রিকেট টিম জয়ী হয়। রানার্স আপ হয়েছে হংসরাজ হিরোস এবং আশিস আসোপা 'ম্যান অব দ্য সিরিজ' পুরস্কার জিতেছে। দর্শক গ্যালারিতে ক্রীড়াপ্রেমীদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন ট্রাস্টের পদাধিকারীগণ।

বেহালা বিবেকানন্দ পাঠচক্রের উদ্যোগে স্বামী বিবেকানন্দ জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন

গত ১২ জানুয়ারি বেহালা বিবেকানন্দ পাঠচক্রের উদ্যোগে পর্ণশ্রী বিবেকানন্দ কানন, পর্ণশ্রী লেক প্রাঙ্গণে স্বামী বিবেকানন্দের ১৬৩ তম জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। স্বামীজীর আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য নিবেদনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন সংস্থার সভাপতি স্বপন কুমার ঘোষ। তারপরেই পাঠচক্রের সদস্য সাগ্নিক ঘোষের নেতৃত্বে সমবেত সঙ্গীত পরিবেশন করেন অন্যান্য সদস্যরা। স্বামীজীর 'মৃত্যুরূপা মাতা' কবিতা পাঠ করেন সদস্যা অন্বেষা সরকার। স্বামীজীর বাণী পাঠ করেন সদস্যা সুকন্যা সর্দার। স্বামীজীর জীবন ও বাণীর বিষয়ে আলোকপাত করেন সদস্য সুদীপ ঘোষ। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ছোটো গল্প বলে শোনান সদস্য শুভ্রজ্যোতি ঘোষ। শেষে সকলে স্বামীজীর চরণে পুষ্পার্পণের এবং সভাপতির ভাষণের পর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

কিষাণ সঙ্ঘের উদ্যোগে ভারতমাতা পূজা

সাধারণতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে মালদহ জেলার গাজোলে ভারতমাতা পূজার আয়োজন করা হয়। কিষাণ সঙ্ঘের জেলা সভাপতি চিত্তরঞ্জন বিশ্বাস প্রথমে জাতীয় পতাকা এবং পরে সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করেন। তারপর ভারতমাতার প্রতিকৃতির সম্মুখে প্রদীপ প্রজ্বলন ও পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন সংস্কার ভারতীর মালদহ জেলা সভাপতি পরেশ চন্দ্র সরকার, কিষাণ সঙ্ঘের জেলা সম্পাদক পার্থ চক্রবর্তী, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নিখিল চন্দ্র মজুমদার, মানবেন্দ্র সরকার, অনুপম গোস্বামী, সঙ্ঘের খণ্ড কার্যবাহ বিপুলবন্ধু বাগচী, জেলা সহ বৌদ্ধিক প্রমুখ দিলীপ সরকার প্রমুখ।

সঙ্ঘ শতবর্ষ উপলক্ষ্যে হিন্দু সম্মেলন

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের শতবর্ষ উপলক্ষ্যে মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোনা রোডে গত ২৯ জানুয়ারি হিন্দু সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সকাল ১০টায় ধ্বজোত্তোলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। প্রথমে সাধুসন্তদের বরণ করে নেওয়া হয়। তারপর চন্দ্রকোনা রোডের শিবমন্দিরের পুরোহিত এবং পতঞ্জলি যোগ প্রচারক সনৎ ঘোষাল শান্তিযজ্ঞ সম্পন্ন করেন। শিশুদের বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, নৃত্য-গীত পরিবেশিত হয়।সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন মিথিলেশ মিশ্র। প্রধান বক্তা হিসেবে ছিলেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের স্বামী প্রদীপ্তানন্দজী মহারাজ এবং হিন্দু জাগরণ মঞ্চের সঞ্জয় শাস্ত্রী মহারাজ। শেষে অঙ্কন প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

পশ্চিমবঙ্গে হিংসা ও সন্ত্রাসহীন বিধানসভা নির্বাচনের লক্ষ্যে আলোচনাচক্র ও সাংবাদিক সম্মেলন

গত ৯ জানুয়ারি 'ফোরাম ফর ইন্টেলেকচুয়ালস্ অ্যান্ড প্রফেশনালস্ অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল'-এর উদ্যোগে কলকাতায় পার্ক স্ট্রিট-স্থিত পার্ক প্লাজায় আয়োজিত হয় একটি আলোচনাচক্র। এ বছর পশ্চিমবঙ্গের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে হিংসা-সন্ত্রাস-রক্তপাতহীন, শান্তিপূর্ণ, অবাধ ও সুরক্ষিত ভোটপর্ব এবং সুষ্ঠু ভোটগণনাপর্বের বিষয়টি উঠে আসে এদিনের আলোচনাচক্রে। রাজ্যে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন সংঘটিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন পদ্ধতির সঠিক প্রয়োগ এবং সুষ্ঠুভাবে ভোটদানের বিষয়টি রূপায়ণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কার্যক্রম ও কার্যপ্রণালীর ব্যাপারে বক্তারা এদিন বক্তব্য রাখেন। এই সংগঠনেরই উদ্যোগে গত ২৭ জানুয়ারি কলকাতা প্রেস ক্লাবে আয়োজিত হয় 'প্রেস কনফারেন্স অন নন-ভায়োলেন্ট, ব্লাডলেস্ অ্যান্ড পিসফুল ইলেকশন-২০২৬'-শীর্ষক একটি সাংবাদিক সম্মেলন। এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের আহ্বায়ক সুধাময় সাহা, সহ-আহ্বায়ক চন্দন কুমার রায়; উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য টি.কে. চ্যাটার্জি, বসন্ত শেঠিয়া, গোপাল সরকার ও প্রদীপ সিংহরায়। রাজ্যের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিষয়ে তাঁরা গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

পশ্চিমবঙ্গে রক্তপাতহীন, সন্ত্রাসমুক্ত, সুষ্ঠু ও সুরক্ষিত বিধানসভা নির্বাচন সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে কী কী করণীয়— সেই বিষয়টি তাঁরা এদিন উপস্থাপন করেন।

অবাধ নির্বাচন সংঘটিত করার যে উপায়গুলি তাঁরা সংবাদমাধ্যমের সামনে তুলে ধরেন সেগুলি হলো—

(১) ভোটদানের জন্য কিউআর কোড আবশ্যিক করা যাতে ওই কোড ছাড়া ভোটকেন্দ্রের মূল কক্ষে প্রবেশ করা যাবে না বা ইভিএম মেশিন চালু হবে না। (২) প্রতিটি ভোটদাতার কাছে কিউআর কোড ভোটদানের ৭ দিন আগে পৌঁছে দেওয়া। (৩) পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজ্যে যেখানে হিংসা ছাড়া ভোটপর্ব হয় না, সেখানে অবশ্যই ভোটদানের একমাস আগে থেকে ও একমাস পরবর্তী সময় পর্যন্ত ভারতীয় সংবিধানের ৩৫৫ বা ৩৫৬ ধারা জারি করে ভোটদান ও গণনাপর্ব সম্পন্ন করা, অথবা রাজ্যের সম্পূর্ণ প্রশাসনিক ক্ষমতা জাতীয় নির্বাচন কমিশনের অধীনে রাখা, অথবা অন্য বিধিবদ্ধ প্রক্রিয়ায় নির্বাচন সম্পন্ন করা এবং সকল প্রকার হিংসা ও সন্ত্রাস রোধ করা। ভোট ঘোষণা থেকে শুরু করে ভোট গ্রহণ ও ভোটগণনার সময়কাল পর্যন্ত রাজ্য প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণ রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপাল বা নির্বাচন কমিশনের হাতে থাকা আবশ্যক। (৪) ভোট সম্পর্কিত হিংসার কারণে বহু মানুষ প্রাণ হারায়, বহু মানুষ স্বজনহারা হন। নির্বাচনে জয়ী শাসকদলের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের দরুন দেশের প্রয়োজনীয় সম্পদ নষ্ট হয় এবং অন্যান্য অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়। এইরকম ক্ষেত্রে তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার, কঠোর শাস্তিপ্রদান এবং প্রয়োজনে ওই ভোটকেন্দ্রে পুনর্নির্বাচন বাধ্যতামূলক করতে হবে। (৫) প্রতিটি হাউসিং কমপ্লেক্স, যেখানে ৬০০ বা ততোধিক ভোটদাতার অবস্থান, সেখানে বুথ বা ভোটকেন্দ্র স্থাপন করা, যাতে সেই ভোটাররা সুষ্ঠুভাবে ভোটদান করতে পারেন। (৬) রাজনৈতিক দলের এজেন্টরা যাতে কোনো অবস্থাতেই ভোটদান কক্ষে অবস্থান না করে। ভোটকক্ষের মধ্যে শুধুমাত্র ভোটদাতা এবং ভোটপর্বের জন্য নির্দিষ্ট আধিকারিক উপস্থিত থাকবে যাতে ভোটকক্ষের ভিতর কোনোরকম অবাঞ্ছিত ঘটনা বা ভোটারকে প্রভাবিত করার মতো ঘটনা না ঘটতে পারে। (৭) ভোটদানের নির্দিষ্ট সময়ের আগে প্রতিটি অঞ্চলে স্থানীয় গুন্ডা ও সন্ত্রাসীদের কারাবন্দি করা। (৮) ভোটগণনাকেন্দ্রে কিছু কিছু ক্ষেত্রে পোস্টাল ব্যালট বাক্স ও ইভিএম মেশিনের বাক্স পরিবর্তনের ঘটনা ঘটে, কর্তব্যরত নিরাপত্তাকর্মীদের ঢিলেমির কারণে। এই ব্যাপারে যথোচিত পদক্ষেপ গ্রহণ, গণনাকেন্দ্রগুলিতে যথেষ্ট সংখ্যক নিরাপত্তাকর্মী মোতায়েন এবং ইভিএমের বাক্সগুলির সুরক্ষা নিশ্চিত করা আবশ্যক। (৯) গণনাকেন্দ্রে ভোটগণনার সময়য়ও বিশাল কারচুপি হয়। গণনাকেন্দ্রগুলিতে রিটার্নিং অফিসার হিসেবে একজন করে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারি আধিকারিক থাকা প্রয়োজন। তাদের নিরপেক্ষতার বিষয়টিও নির্বাচন কমিশনকে নিশ্চিত করতে হবে। (১০) গণনাকেন্দ্রে রিটার্নিং অফিসার ছাড়া উপস্থিত অন্যান্য অফিসারদের মধ্যেও কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারি আধিকারিকের সংখ্যা সমান হতে হবে অথবা অন্য বিধিবদ্ধ প্রক্রিয়ায় সঠিক ভোটগণনা নিশ্চিত করতে হবে। (১১) ভোটগণনাকেন্দ্রে বিরোধী দলের কাউন্টিং এজেন্টদের বিভিন্নভাবে অস্ত্র দেখিয়ে ভীতি প্রদর্শন করা হয়। সেক্ষেত্রে গণনাকেন্দ্রে নিরাপত্তা ব্যবস্থা মজবুত করে এই ধরনের ভীতি প্রদর্শন বন্ধ করতে হবে।

বঙ্গীয় হিন্দু জাগরণের উদ্যোগে বর্ণাঢ্য তিরঙ্গা পদযাত্রা

গত ২৬ জানুয়ারি 'বঙ্গীয় হিন্দু জাগরণ, যাদবপুর'-এর উদ্যোগে উদ্‌যাপিত হয় ভারতের ৭৭তম সাধারণতন্ত্র দিবস। এতদুপলক্ষ্যে সামর্থ্য, একতা ও বীরত্বের আদর্শে পরিচালিত বঙ্গীয় হিন্দু জাগরণ ও হিন্দু জাগরণ মঞ্চের উদ্যোগে দক্ষিণ কলকাতায় যাদবপুর ৮বি বাস স্ট্যান্ড থেকে বাঘাযতীন মোড় পর্যন্ত আয়োজিত হয় একটি বর্ণাঢ্য তিরঙ্গা পদযাত্রা। একটি ৭০ ফুট দীর্ঘ জাতীয় পতাকাকে আঁকড়ে ধরে অনুষ্ঠিত এই পদযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন অসংখ্য জাতীয়তাবাদী মানুষ। পদযাত্রা থেকে অনবরত উচ্চারিত হয় 'জয় হিন্দ' ও 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি। বঙ্গীয় হিন্দু জাগরণের উদ্যোগেই বাঘাযতীন মোড়ে এদিন আয়োজিত হয় ভারতমাতার পূজা। পূজাস্থলেই এদিন পদযাত্রাটি শেষ হয়। পদযাত্রা শেষে সকলের উদ্দেশ্যে বক্তব্য উপস্থাপন করেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সাংগঠনিক কলকাতা মহানগরের বৌদ্ধিক প্রমুখ মধুসূদন কর। পূজাস্থলে সকলে প্রসাদ গ্রহণ করেন।

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের দীর্ঘজীবন কামনা করে যজ্ঞানুষ্ঠান

মধ্য কলকাতার মিত্র ইনস্টিটিউশনে শিক্ষকতা করতেন বিপ্লবী শিবপ্রসাদ নাগ। ছাত্রদের কাছে তিনি 'মাস্টারমশাই' নামে পরিচিত ছিলেন। জাতীয়তাবাদী, দেশপ্রেমিকদের কাছে নেতাজী সুভাষচন্দ্র এক মৃত্যুহীন প্রাণ। ১৯৪৮ সালের ২৩ জানুয়ারি মধ্য কলকাতায় শ্রদ্ধানন্দ পার্কে তাঁর ছাত্রদের নিয়ে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের দীর্ঘজীবন কামনা করে একটি যজ্ঞানুষ্ঠানের সূচনা করেন নেতাজী-অন্তঃপ্রাণ মাস্টারমশাই। পরবর্তীকালে তিনি সোদপুর চন্দ্রচূড় বিদ্যাপীঠে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। প্রতি বছর নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জন্মদিনে তাঁর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এই যজ্ঞের মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্নভাবে চলে নেতাজী জয়ন্তী উদ্‌যাপন। তাঁর মৃত্যুর পর সোদপুরের মহেন্দ্রনগরে তাঁর ছাত্র ডাঃ নিতাই চন্দ্র বিশ্বাসের উদ্যোগে প্রতি বছর হয়ে চলেছে এই যজ্ঞানুষ্ঠান। অন্যান্য বছরের মতো, গত ২৩ জানুয়ারি তাঁর বাসভবনে আয়োজিত হয় বিশেষ পূজা, চণ্ডীপাঠ এবং নেতাজী সুভাষচন্দ্রের দীর্ঘজীবন প্রার্থনায় হোমযজ্ঞ। পূজা ও যজ্ঞের পুরোহিত ছিলেন বাসুদেব গঙ্গোপাধ্যায়, রবীন চট্টোপাধ্যায় ও বিনয় মুখোপাধ্যায়। উপস্থিত ছিলেন সুকান্ত বিশ্বাস, সর্বেশ্বর চক্রবর্তী, ডাঃ বিজয় কেতন মুখোপাধ্যায়, মানস অধিকারী, শিবাজী ভট্টাচার্য, কৃষ্ণ রায়, শুভজিৎ রায়, স্বপন কুণ্ডু, মলয় বিশ্বাস, প্রবীর বিশ্বাস, পুলক সরকার, সমর সরকার, বাবলু দেবরায়, দুলাল দাশ, কাজল দে, সৌভিক দে, সেন্টু দত্ত প্রমুখ নেতাজীপ্রেমী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সাংবাদিক সঞ্জয় বণিক, মনোজিৎ দাশ, সুদেষ্ণা দে, অশোক ঘোষ, চিত্র সাংবাদিক শ্যামল কর এবং সাপ্তাহিক স্বস্তিকা-র সম্পাদকীয় বিভাগের সদস্য অংশুমান গঙ্গোপাধ্যায়। দুপুর ১২টা ৪২ মিনিটে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জন্মমুহূর্তে শঙ্খধ্বনি করা হয়। পূর্ণাহুতির পর যজ্ঞ সমাপ্ত হলে সকলে প্রসাদ গ্রহণ করেন। সন্ধ্যায় আতশবাজি প্রদর্শনী-সহ নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ১৩০তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে নেতাজী অনুগামীরা ১৩০টি মোমবাতি প্রজ্বলন করেন। বিশ্বজুড়ে আজ ঘনিয়ে উঠছে নানা সংকট।

এই পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ ও উদ্ধারকল্পে সকলে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আশীর্বাদ ও পুনরাবির্ভাব প্রার্থনা করেন।

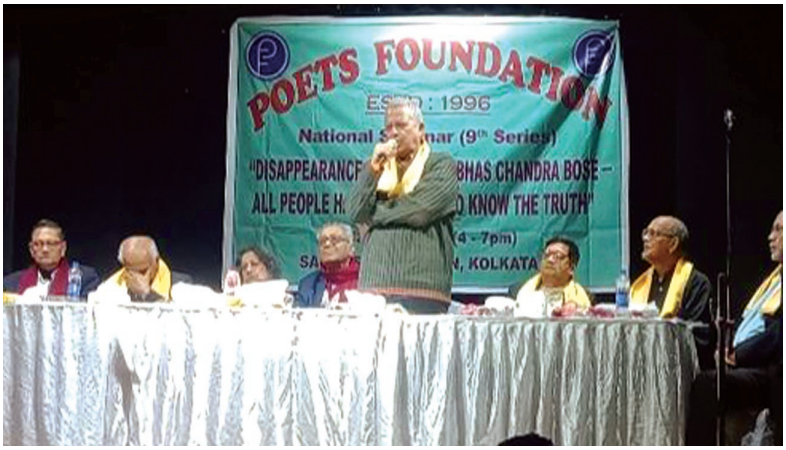

পোয়েট্‌স্ ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধান রহস্য বিষয়ক আলোচনাসভা

গত ১৭ জানুয়ারি 'পোয়েট্‌স্ ফাউন্ডেশন'-এর উদ্যোগে দক্ষিণ কলকাতায় রাসবিহারী অ্যাভিনিউ-স্থিত শরৎ স্মৃতি সদনে আয়োজিত হয় 'ডিজ্যাপিয়ারেন্স অফ নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস— অল পিপল্ হ্যাভ দ্য রাইট টু নো দ্য ট্রুথ'-শীর্ষক একটি জাতীয় স্তরীয় আলোচনাসভা। এদিনের সভায় সভাপতিত্ব করেন পোয়েট্‌স্ ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা ও মুখ্য উপদেষ্টা প্রদীপকুমার চৌধুরী। আলোচনাসভায় অংশগ্রহণ করেন— ত্রিপুরা ও মেঘালয়ের প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়, ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রাক্তন আধিকারিক মেজর জেনারেল প্রবীর চক্রবর্তী, আমেরিকার ক্রিসলার কর্পোরেশনের পূর্বতন আধিকারিক ও ইঞ্জিনিয়ার ভাস্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, আজাদ হিন্দ পিপল্‌স্ মিশনের চেয়ারম্যান ও বিশিষ্ট নেতাজী গবেষক ড. জয়ন্ত চৌধুরী, নেতাজী সুভাষচন্দ্রের অগ্রজ ভ্রাতা শরৎচন্দ্র বসুর পৌত্র চন্দ্র কুমার বসু এবং সিপিডব্লুডি-র পূর্বতন চিফ আর্কিটেক্ট সুমেরু রায়চৌধুরী। আলোচনাসভাটির সঞ্চালকের ভূমিকা নির্বাহ করেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বতন অধ্যাপিকা ও নেতাজী ভাবনা মঞ্চের সভানেত্রী ড. পূরবী রায়। ১৯৪৫ সালের ১৮ আগস্ট তাইহোকুতে বিমান দুর্ঘটনার আখ্যানের অন্তরালে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের রহস্যময় অন্তর্ধান এবং সেই অন্তর্ধান রহস্যের সমাধানে বিভিন্ন তদন্ত কমিনের রিপোর্টের বিষয়গুলি আলোচনাসভায় অংশগ্রহণকারী বিশিষ্টজনদের বক্তব্যে এদিন উঠে আসে। সকলের বক্তব্যের শেষে শুরু হয় প্রশ্নোত্তর পর্ব। শ্রোতাদের পক্ষ থেকে উত্থাপিত নানা প্রশ্নের উত্তর দেন আলোচকরা। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধান বিষয়ে শ্রোতাদের সঙ্গে তাঁদের নানা মতবিনিময়ও হয়।

দত্তপুকুরে 'সহস্র কণ্ঠে গীতাপাঠ'

গত ১১ জানুয়ারি 'সনাতন হিন্দু ধর্ম সংগঠন'-এর উদ্যোগে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার দত্তপুকুরে আয়োজিত হয় 'সহস্র কণ্ঠে গীতাপাঠ'-এর অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তারূপে উপস্থিত ছিলেন পূজ্য সন্ত— স্বামী পরমাত্মানন্দ গিরি মহারাজ ও হিরণ্ময় গোস্বামী মহারাজ। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দান করেন সনাতন হিন্দুধর্ম সংগঠনের আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. গোপাল চক্রবর্তী। এদিনের গীতাপাঠ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন প্রায় পাঁচ হাজার মানুষ। অনুষ্ঠানের শুরুতে বালক-বালিকারা গীতাপাঠ করে শোনায়। তারপরে দুই সন্ন্যাসীর উপস্থিতিতে সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ের পাঁচ জন ছাত্র মিলে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রথম, একাদশ ও অষ্টাদশ অধ্যায় পাঠ করেন। তারপর স্বামী পরমাত্মানন্দ গিরি মহারাজ ও হিরণ্ময় গোস্বামী মহারাজ তাঁদের প্রবচনে শাস্ত্র অনুসরণ ও শস্ত্র অনুশীলনের মাধ্যমে সমস্ত প্রকার অন্যায়ের বিরুদ্ধে হিন্দুদের জেগে ওঠার আহ্বান জানান। সমাজ, ধর্ম ও রাষ্ট্ররক্ষার প্রতি দায়বদ্ধতার বিষয়টি সকল সনাতনীদের তাঁরা বারবার স্মরণ করিয়ে দেন। অনুষ্ঠানে সব বয়সের সনাতনী হিন্দুরা পরমোৎসাহে অংশগ্রহণ করেন। এরপর নৃত্যানুষ্ঠানের শেষে খিচুড়ি প্রসাদ বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলে সেই প্রসাদ গ্রহণ করেন।

সিউড়ীতে শ্রদ্ধার পঞ্চদশ অনুভবী সম্মেলন

গত ১৮ জানুয়ারি বীরভূম জেলার বিশিষ্ট সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংস্থা শ্রদ্ধার পঞ্চদশ অনুভবী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো সিউড়ী শহরের অরবিন্দপল্লী সরস্বতী শিশু মন্দিরে। এদিন সকাল ন'টায় শঙ্খধ্বনির পর তিনবার ওঙ্কার উচ্চারণের মাধ্যমে সম্মেলনের সূচনা করেন সংস্থার সংগঠন সম্পাদক লক্ষ্মণ বিষ্ণু। প্রদীপ প্রজ্বলন করেন স্টেট ব্যাংকের অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল ম্যানেজার পুলক সিনহা, সংস্থার সভাপতি মহাদেব মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক দামোদর ঘোষাল এবং পূজ্যপাদ স্বামী বরদানন্দ মহারাজ। এরপর পবিত্র ওঙ্কার, ভারতমাতা, স্বামী বিবেকানন্দ এবং সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি স্বর্গীয় নিরঞ্জন হালদার (ছোড়দা)-এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন উপস্থিত সকলেই। প্রাস্তাবিক ভাষণ রাখেন সহ সভাপতি আগমানন্দ মুখোপাধ্যায়। সঙ্গীত পরিবেশন করেন সুব্রত নন্দন, প্রতিভা চট্টোপাধ্যায়, অসীমা মুখোপাধ্যায়, রুপালী ঘোষাল এবং শিশুশিল্পী শিবব্রত ভট্টাচার্য। আবৃত্তি করেন মৃণাল চক্রবর্তী এবং বিশিষ্ট বাচিক শিল্পী তথা সুরসঞ্চালক মিলন চক্রবর্তী। বক্তব্য রাখেন শিশুমন্দিরের প্রধান আচার্য নির্মল ঠাকুর, ড. হীরক চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপিকা নিবেদিতা মুখোপাধ্যায় এবং সংস্থার কোষাধ্যক্ষ এবং শিশুমন্দিরের জেলা সমিতির সম্পাদক বিশ্বনাথ দে।

হারানো পত্রিকা—ছয়

যমুনা মানেই শরৎচন্দ্র, আর...

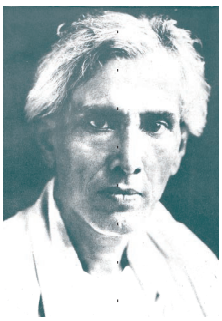

নন্দলাল ভট্টাচার্য

বাংলা সাহিত্য ও পত্রপত্রিকার ইতিহাসে এ কোনো বিরল ঘটনা নয়। কোনো একজন লেখককে কেন্দ্র করে আবর্তিত বহু পত্রিকাই জনপ্রিয়তার শিখরে উঠেছে ওই এক লেখকের রচনার গুণেই। বিশ শতকের একবারে গোড়ায় প্রকাশিত 'যমুনা' মাসিক পত্রিকার ক্ষেত্রে ঘটে তেমনই ঘটনা। বস্তুত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে লেখক হিসেবে পাঠকমহলে প্রতিষ্ঠিত করার দাবিদার 'যমুনা'। অন্যদিকে শরৎ রচনায় সমৃদ্ধ হওয়ার কারণেই 'যমুনা' পায় পাঠকমহলের উদার সমর্থন।

'যমুনা' মাসিক পত্রিকা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে ১৩১০ বঙ্গাব্দের বৈশাখ বা ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে। পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন ধীরেন্দ্রনাথ পাল। ১৬ পৃষ্ঠার কাগজটির মাপ ছিল ২৩×১৫ সেমি। প্রাথমিক পর্বেই 'যমুনা' জনপ্রিয় হয়েছিল এমন দাবি কখনোই করা সম্ভব নয়। বরং প্রথম পাঁচ বছরে তিন-তিনবার পত্রিকাটির প্রকাশনায় ছেদ পড়ে। তা সত্ত্বেও মাসিক পত্রিকা 'যমুনা' চলেছিল প্রায় ২০ বছর। ১৩৩০ বঙ্গাব্দে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায় চিরতরে।

'যমুনা'-র অবস্থা যখন প্রায় টালমাটাল সেই সময় পত্রিকার সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ পালের যোগাযোগ ঘটে প্রায় নবীন লেখক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের। বঙ্গদেশে জীবিকার তেমন উপায় না দেখেই শরৎচন্দ্র সেসময় রেঙ্গুনবাসী। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবরে এক মাসের ছুটি নিয়ে দেশে আসেন। ওই সময় মামা উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের মাধ্যমে ফণীন্দ্রনাথ পালের সঙ্গে পরিচয় হয়। শরৎচন্দ্রের সব কথা শুনে ফণীন্দ্রনাথ পাল মুগ্ধ হন। তিনি শরৎচন্দ্রের মধ্যে দেখতে পান বিরাট সম্ভাবনার এক আগুনের ফুলকি। শুধু দেখা নয়, এক দৃঢ় প্রত্যয় জন্মায় তাঁর মনে। সেই প্রত্যয় থেকেই সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ তাঁকে 'যমুনা'-য় লেখা দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানান। শরৎচন্দ্র কথা দেন রেঙ্গুনে ফিরে গিয়েই তিনি লেখা পাঠাবেন।

কথা রাখেন শরৎচন্দ্র। স্বভাব-মন্থর লেখক হলেও শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনে গিয়ে তাঁর 'রামের সুমতি' গল্পটি পাঠিয়ে দেন। ফণীবাবু এই গল্প তাঁর কাগজে ১৩১৯ সালের ফাল্গুন ও চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশ করেন। রামের সুমতি 'যমুনায় প্রকাশিত হলে শরৎচন্দ্র এক গল্প লিখেই একজন মহাশক্তিশালী লেখক হিসেবে সাহিত্যিক ও পাঠকমহলে পরিচিত হন।' (গোপালচন্দ্র রায় : শরৎচন্দ্র, শরৎ রচনাবলী, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, পৃ. ৫৯৫)।

'রামের সুমতি' প্রকাশিত হওয়ার পর 'ভারতবর্ষ', 'সাহিত্য' প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদকও তাঁর গল্পের জন্য দরবার করতে থাকেন। শরৎচন্দ্রও লেখা পাঠাতে থাকেন। 'যমুনা'র সঙ্গে সঙ্গে ওইসব কাগজেও নিয়মিত লিখতে শুরু করেন তিনি।

প্রসঙ্গত, এর আগে ১৩১৪ সালের 'ভারতী' পত্রিকার বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসের সংখ্যায় শরৎচন্দ্রের 'বড়দিদি' প্রকাশিত হয়। প্রথম দুই সংখ্যায় লেখকের নাম ছিল না। ফলে সেটি রবীন্দ্রনাথের লেখা বলে এক ধরনের বিভ্রম জাগে পাঠকমহলে। আষাঢ় সংখ্যায় অবশ্য লেখক শরৎচন্দ্রর নামই প্রকাশিত হয়। এর কয়েক বছর পরে ১৯১৩-র সেপ্টেম্বর অর্থাৎ ১৩২০-র ভাদ্র-আশ্বিন মাস নাগাদ 'যমুনা' সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ বই আকারে 'বড়দিদি' প্রকাশ করেন। এটিই শরৎচন্দ্রর প্রথম ছাপা বই।

পরবর্তীকালে শরৎচন্দ্র বিখ্যাত পুস্তক প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে একরকম চুক্তিবদ্ধ হয়ে কেবল 'ভারতবর্ষ' পত্রিকাতেই লিখতে থাকেন। যদিও পাঠক, সাহিত্যিক ও প্রকাশক মহলের সঙ্গে 'যমুনা' পত্রিকাই শরৎচন্দ্রের পরিচয় ঘটিয়েছিল। বস্তুত, 'যমুনা' পত্রিকার লেখার জন্যই শরৎচন্দ্র সাহিত্যিক হিসেবে প্রতিষ্ঠা পান।

কেউ কেউ অবশ্য বলে থাকেন, 'রামের সুমতি' নয়, 'যমুনা'য় শরৎচন্দ্রর প্রথম লেখাটির নাম ছিল 'বোমা' নামে একটি গল্প। এটি প্রকাশিত হয়েছিল 'যমুনা'-র ১৩১৯ সালের কার্তিক-পৌষ সংখ্যায়। গল্পটি প্রকাশিত হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পাঠকমহলে আলোড়ন পড়ে। নতুন লেখককে

সকলেই সাদরে বরণ করে নেন। সকলেই পড়তে চান নবীন লেখক শরৎচন্দ্রর আরও লেখা।

পাঠকদের চাহিদার কথা মাথায় রেখেই শরৎচন্দ্রকে নিয়মিত লেখা পাঠাবার অন্য অনুরোধ জানায় 'যমুনা'। শরৎচন্দ্রও সে অনুরোধে সাড়া দিয়ে পাঠাতে থাকেন একের পর এক লেখা। এক সময় 'যমুনা' এবং শরৎচন্দ্র যেন সমার্থক হয়ে ওঠেন।

'যমুনা'-য় প্রকাশিত শরৎচন্দ্রের বিখ্যাত রচনার তালিকায় আছে 'চন্দ্রনাথ' (বৈশাখ—আশ্বিন, ১৩২০), 'পরিণীতা' (ফাল্গুন ১৩২০), 'পথনির্দেশ' (বৈশাখ ১৩২১), 'আলো ও ছায়া' (আষাঢ়-ভাদ্র ১৩২১), 'বিন্দুর ছেলে' (শ্রাবণ ১৩২১) প্রভৃতি গল্প ও উপন্যাস। 'যমুনা'-র ১৩২০ সালের বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, ভাদ্র ও আশ্বিন সংখ্যায় অনিলা দেবী ছদ্মনামে শরৎচন্দ্র লেখেন 'নারীর মূল্য' প্রবন্ধটি।

'নারীর মূল্য'-র শেষ কিস্তি ছাপার আগে শরৎচন্দ্র 'যমুনা'— সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথকে এক চিঠিতে লেখেন, 'নারীর মূল্য আগামী বারে শেষ করিয়া আর একটা শুরু করিব। নারীর মূল্যের বহু সুখ্যাতি হইয়াছে আমি মনে করিয়াছি, ১৪টা মূল্য ওই রকমের লিখিব। এবারে হয় প্রেমের মূল্য, না হয় ভগবানের মূল্য লিখিব। তারপর ক্রমশ ধর্মের মূল্য, নেশার মূল্য, সাংখ্যের মূল্য ও বেদান্তের মূল্য লিখিব।' (রেঙ্গুন থেকে ১৪.৯.১৩ তারিখে লেখা)। শেষ পর্যন্ত শরৎচন্দ্রর এই পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত হয়নি।

১৩২১-এর কার্তিক সংখ্যা থেকেই প্রকাশিত হতে থাকে শরৎচন্দ্রের বিখ্যাত উপন্যাস 'চরিত্রহীন'। চৈত্র পর্যন্ত ধারাবাহিক কিন্তু আংশিকভাবে প্রকাশিত হয় উপন্যাসটি। এরপর আর কোথাও প্রকাশিত হয়নি উপন্যাসটি।

১৯১২ খ্রিস্টাব্দে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে প্রথম আলাপেই ফণীন্দ্রনাথ পাল 'যমুনা'-র জন্য 'চরিত্রহীন' উপন্যাসটি চেয়েছিলেন। কিন্তু সেসময় শরৎচন্দ্রের পক্ষে এটি দেওয়া সম্ভব হয়নি। শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন থেকে 'যমুনা'-র সম্পাদক ফণীবাবুকে লেখেন, 'আমি চরিত্রহীনের জন্য অনেক চিঠিপত্র পাইতেছি। কেহ টাকার লোভ, কেহ সম্মানের লোভ, কেহ-বা দুই-ই, কেহ-বা বন্ধুত্বের অনুরোধও করিতেছেন। আমি কিছুই চাহি না— আপনাকে বলিয়াছি, আপনার মঙ্গল যাহাতে হয় করিব— তাহা করিবই। আমি কথা বদলাই না।'

বাস্তবে সম্পূর্ণ 'চরিত্রহীন' উপন্যাসটি কোনো পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি। উপন্যাসটি প্রকাশ করেন এমসি সরকার অ্যান্ড সনস্ ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের ১১ নভেম্বর। অর্থাৎ 'যমুনা'য় উপন্যাসটি কিছু অংশ প্রকাশের প্রায় বছর চার পরে। এই প্রসঙ্গে একটি মজার কাহিনি শুনিয়েছেন এমসি সরকার অ্যান্ড সনস্-এর সুধীরচন্দ্র সরকার। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় 'যমুনা'-র অফিসে। 'যমুনা'-র অফিস ছিল তখন বর্তমান বিধান সরণি (সাবেক কর্নওয়ালিশ স্ট্রিট) এবং সুকিয়া স্ট্রিটের সংযোগস্থলে, দোতলায়। 'যমুনা' পত্রিকার এই অফিসে বসতো এক আড্ডা। আড্ডাধারীরা সকলেই সাহিত্যিক ও সাহিত্যপ্রেমী। সুধীরচন্দ্র লিখছেন, 'একদিন দুপুরবেলা আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে বেশ আড্ডা জমিয়েছি। দলের মধ্যে ছিল প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, চারু রায়, হেমেন্দ্রকুমার রায় এবং আর কেউ কেউ। —আলোচনা হচ্ছিল 'যমুনা' প্রকাশে ক্রমশই বেশ দেরি হয়ে যাচ্ছে সেই বিষয়ে। আর দেরির একমাত্র কারণ শরৎচন্দ্র। শরৎচন্দ্র তখন রেঙ্গুনে ছিলেন— সেখান থেকে সময়মতো তাঁর 'চরিত্রহীনের' কিস্তি এসে পৌঁছোচ্ছে না। —এই নিয়ে আমরা একটু উত্তেজিতভাবে আলোচনা করছি— আমাদের কে যেন বলে উঠল, শরৎবাবু নিশ্চয় চরিত্রহীন, তাই 'চরিত্রহীন' লেখা পাঠাতে দেরি হচ্ছে। —ঠিক সেই সময়েই ঘরের দরজাটি খুলে একজন প্রবেশ করলেন। সঙ্গে আবার একটা কুকুর। সাধারণ জামা কাপড় পরা শীর্ণকায়, খোঁচা খোঁচা দাড়িওয়ালা লোকটি। —বললেন, ফণীবাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। তাঁকে বলা হলো যে তিনি তো এখন নেই, সন্ধেবেলায় আসবেন, তখন এসে তাঁর সঙ্গে দেখা হবে।

আগন্তুক ভদ্রলোকটি বললেন, তাহলে আমি একটু অপেক্ষা করে তাঁর সঙ্গে দেখা করেই যাব। অনেক দূর দেশ থেকে আসছি কিনা। একটু থেমে আবার বললেন, আর একটা কথা— শরৎচন্দ্র চরিত্রহীন নন, তিনি ঠিক সময়েই লেখা দেবেন।

হঠাৎ শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে তাঁকে ওকালতি করতে শুনে প্রেমাঙ্কুর বলে উঠলো, শরৎচন্দ্র ঠিক সময়ে লেখা দেবেন কিনা সে খবর আপনি জানলেন কী করে?

ভদ্রলোক একটু হেসে বললেন, আমারই নাম শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

ঘরের মধ্যে বোমা ফাটলেও আমরা এতটা অবাক হতাম না। কয়েক মুহূর্ত আমাদের মুখ দিয়ে কোনো কথাই বেরুল না। চারুই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে বলল, আপনিই শরৎচন্দ্র— সত্যি কথা বলতে কী— আমরা ভেবেছিলুম কোনো— মুখের কথাটা কেড়ে নিয়ে শরৎচন্দ্র বললেন : কোনো দপ্তরী। বলে তিনি হাসতে লাগলেন। আমরাও সে হাসিতে যোগ দিলাম।' (আমার কাল আমার দেশ : পৃ. ২০-২২)।

এসব অবশ্য ভিন্ন প্রসঙ্গ। সত্য এই, বাংলা সাহিত্যের পাঠকদের কাছে

সার্থকভাবে শরৎচন্দ্রের পরিচয় ঘটিয়েছিল 'যমুনা' পত্রিকা। 'যমুনা' যেভাবে শরৎচন্দ্রকে বাংলার পাঠকের হয়ে সিংহাসনে অভিষিক্ত করে, সেভাবে আর কোনো পত্রিকাকে এগিয়ে আসতে দেখা যায়নি। এর আগেও কোনো কোনো পত্রিকার সঙ্গে কোনো কোনো সাহিত্যিকের একটা সম্পর্ক গড়ে উঠলেও নানা কারণেই 'যমুনা' এবং শরৎচন্দ্রের সম্পর্কটা ছিল বাতিক্রমী। 'যমুনা' নিঃস্বার্থভাবে শরৎচন্দ্রকে তুলে ধরেছিল তা নয়। এই তুলে ধরার মধ্য দিয়ে 'যমুনা'-ও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক ধরনের অমরত্বের দাবিদার হয়ে যায়। কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র সম্পর্কে যেকোনো ধরনের আলোচনার এক অপরিহার্য হয়ে রয়েছে 'যমুনা'। আর খুব বেশি কিন্তু কোনো লেখকের জীবনে এসব ভূমিকা নিতে দেখা যায়নি। হয়তো যাবেও না।

তবে পুরো ব্যাপারটিই একমুখী ছিল না। 'যমুনা' যেমন শরৎচন্দ্রের প্রতিষ্ঠার পথটি তৈরি করে দেয়, শরৎচন্দ্রও একইভাবে 'যমুনা'-কে সমস্ত দিক থেকে উন্নত করার জন্য সক্রিয় ভূমিকা নেন। কেবল লেখা দিয়ে নয়, তারও বাইরে একটা বৃহৎ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে দেখা যায় তাঁকে। এমনকী ১৩২১ সালে শরৎচন্দ্র 'যমুনা'-র অন্যতম সম্পাদক হন। এতসব সত্ত্বেও শেষপর্যন্ত 'যমুনা'-র সঙ্গে শরৎচন্দ্রের সম্পর্কটা মধুর থাকে না। নিঃসন্দেহে 'যমুনা'-র সঙ্গে শরৎচন্দ্রের বিচ্ছেদ বাংলা সাহিত্যের একটা বড়ো ট্র্যাজেডি।

'যমুনা'-র সম্পাদক ছিলেন তখন ফণীন্দ্রনাথ। এই ফণীন্দ্রনাথই ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে প্রথম শরৎচন্দ্রের গল্পটি প্রকাশ করেন। তাঁর অনুরোধেই রেঙ্গুন থেকে শরৎচন্দ্র 'যমুনা'-র জন্য লেখা পাঠাতে থাকেন। কলকাতায় এসে তিনি সক্রিয়ভাবে 'যমুনা'-র সঙ্গে যুক্ত হন। পত্রিকার সহযোগী সম্পাদকও হন। কিন্তু শেষপর্যন্ত তাঁর সঙ্গে মতোবিরোধের কারণেই শরৎচন্দ্র 'যমুনা'-র সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করেন। বলা যায় এরই পরিণতিতে ১৩৩০ বঙ্গাব্দ বা ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে চিরতরে থেমে যায় 'যমুনা'-র যাত্রা।

১৩১০ বঙ্গাব্দে ধীরেন্দ্রনাথ পালের সম্পাদনায় শুরু হয়েছিল 'যমুনা'-র যাত্রা। এই যাত্রাপথে ধীরেন্দ্রনাথই ছিলেন 'যমুনা'-র মূল রসদদার। প্রথম থেকেই 'যমুনা'-র যাত্রাপথে আসে একটার পর একটা বাধা। ওইসব বাধার কারণে 'যমুনা'-র যাত্রা মাঝেমাঝেই হয় বিঘ্নিত। সেই বিঘ্নের কারণেই ১৩১৩ সালে সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়। তবে সে বাধা স্থায়ী রূপ নিতে পারেনি। আবার এগিয়ে চলে 'যমুনা'। ১৩১৫ থেকে ১৩১৭-এর মধ্যে তিনবার অনিয়মিত হয়ে পড়ে।

'যমুনা' আবার নিয়মিত হয় ১৩১৭ সালে। নবকলেবরে প্রকাশিত হতে থাকে মাসিক 'যমুনা'। সতীশচন্দ্র সিংহ, দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার, ধীরেন্দ্রনাথের ছেলে যতীন্দ্রনাথ পাল এবং গুরুদাস আদকের সম্পাদনায় ওই বছরের আশ্বিন ও কার্তিক মাসের 'যমুনা' সম্পাদনায় তাঁদের সহায়তা করেন ওই সময়ের প্রখ্যাত সাহিত্যসেবী ব্যোমকেশ মুস্তাফী। সব মিলিয়ে 'যমুনা' তখন তরঙ্গ-সংকুল। পত্রিকার পৃষ্ঠা সংখ্যাও বেড়ে হয় ৩২। কিন্তু সেই 'যমুনা' আবার হয় নিস্তরঙ্গ। ওই বছরের মাঘ মাসে ধীরেন্দ্রনাথের মৃত্যু হলে দেখা দেয় নানা ধরনের বিশৃঙ্খলা। ওই রকম অবস্থায় ১৩১৮ বঙ্গাব্দে 'যমুনা'-র সম্পাদক হন ফণীন্দ্রনাথ পাল। বলা যায় শুরু হয় 'যমুনা'-র স্বর্ণযুগ। ফণীন্দ্রনাথের ব্যবহার ও সম্পাদনার গুণে বাড়তে থাকে গ্রাহকসংখ্যা। সেই সঙ্গে শরৎচন্দ্রের মতো সাহিত্যিকরা হয়ে ওঠেন 'যমুনা'-র সম্পদ।

ফণীন্দ্রনাথের ব্যবহার ও সুসম্পাদনা সম্পর্কে পরবর্তীকালে 'যমুনা' সম্পাদনায় সহযোগী বিখ্যাত কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচি মন্তব্য করেন, ''অমন স্বার্থলেশহীন দেবচরিত্র ও নিরহংকার সরল আচরণ ওই বয়সের আর কোনো ব্যক্তির পক্ষে অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। অল্পদিনেই তাঁহার সহিত আমার প্রগাঢ় বান্ধবতা হইয়াছিল এবং পরে ওই 'যমুনা'-রই বৈঠকে বাঙ্গলার অদ্বিতীয় কথাশিল্পী ও মহাপ্রতিভার অধিকারী শরৎচন্দ্রের সৌহার্দ্যলাভ করিয়াছিলাম। এই ফণীবাবুর সহযোগিতায় পাঁচ বৎসর 'যমুনা'-র সম্পাদনা কার্যও আমাকে করিতে হইয়াছিল।''

বলা ভালো, 'যমুনা'-র ১৩২৮ এবং ১৩২৯-এর সংখ্যায় ফণীন্দ্রনাথ পালের সঙ্গে যতীন্দ্রমোহনের নামও ছাপা হয়েছিল। ১৩৩০-এ যতীন্দ্রমোহনের জায়গায় 'যমুনা'-র যুগ্ম সম্পাদক হন চারুচন্দ্র মিত্র। আর ওই বছরেই 'যমুনা'-র প্রকাশ বন্ধ হয় চিরতরে।

বিভিন্ন তথ্য ও বিবরণ থেকে বোঝা যায়, 'যমুনা' পাঠকদের আনুকূল্য পেলেও পত্রিকা পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রথম থেকেই বেশ কিছু গলদ ছিল। মালিক তথা পরিচালকদের অকারণ হস্তক্ষেপ বহু সময়ই পত্রিকা প্রকাশের অন্তরায় হয়ে ওঠে। আর ওইসব কারণেই ১৩১০ থেকে ১৩৩০ পর্যন্ত দুই দশকের যাত্রাপথে পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হয়েছে বেশ কয়েকবার। এরই ফলে পত্রিকার প্রকাশ বহু সময়ই ছিল অনিয়মিত। আর ওইসব কারণেই সুসম্পাদিত ও জনপ্রিয় পত্রিকা হওয়া সত্ত্বেও 'যমুনা' দীর্ঘজীবী হতে পারেনি। এক সময়ের জনপ্রিয় পত্রিকাটির নাম তাই বর্তমানে প্রায় স্থায়ীভাবেই হারিয়ে গেছে বিস্মৃতির নিকষ কালো অন্ধকারে।

ভারতের শাড়ি-ঐতিহ্যে বিমোহিত বিশ্ব

কৌশিক রায়

বেনারসি, বালুচরি, কাঞ্জীভরম, পোচমপল্লী, জামদানি, কটকি, ইক্কত, বোমবাই— এই শব্দগুলি এখন শুধু ভারতীয় মহিলাদের কাছেই নয়, বিদেশিনীদের কাছেও অত্যন্ত প্রিয়। কেননা, এই ভারতীয় ঐতিহ্যবাহী শাড়িগুলি ডিজাইন ও সৃজনের বহুধা বিচিত্রতার নান্দনিক বিন্যাসে এখন গোটা বিশ্বকে বিমুগ্ধ করছে। ভারতের বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলের কারিগরদের দ্বারা তৈরি হওয়া এই শাড়িগুলির সূত্র নিহিত আছে আজ থেকে ৩ হাজার বছর আগে সিন্ধু সভ্যতায় হাতে বোনা, রঞ্জিত শাড়ির মধ্যে। ভারতের সুতির শাড়ির অকুণ্ঠ প্রশংসা পাওয়া যায় গ্রিক ঐতিহাসিক হোরাদোতুসের রচনাতেও। স্থল ও সমুদ্র বাণিজ্যপথে ভারত থেকে চীন, মধ্য এশিয়া ও ইউরোপে রপ্তানি হতো বহু শাড়ি। সপ্তদশ শতকের প্রথম দিকে ক্রমশই বণিকের মানদণ্ড থেকে রাজদণ্ডের প্রভুত্বে পরিণত হওয়া ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কাঁচা তুলো থেকে সুতো ও কাপড় তৈরি করে বিশ্বের সর্বত্র ব্যবসা করতে শুরু করে। পৃথিবীর ৯০ শতাংশ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে ভারতীয় সুতির কাপড়। গ্রামীণ মানুষকে, বিশেষত দরিদ্র মহিলাদের স্বনির্ভর করে তুলতে, ভারতে স্বদেশিয়ানা আনতে চরকাতে খাদির কাপড় বুনতে শুরু করেন গান্ধীজী। সেই বস্ত্র শিল্প উজ্জীবনের সূত্র ধরেই গ্রামীণ বস্ত্র ঐতিহ্যর ধারাতে সঞ্জীবিত হয়ে বর্তমান নগরায়িত বিশ্বের ফ্যাশন ঘরানাকে বিস্মিত, সমৃদ্ধ করে তুলেছে ভারতীয় শাড়ির অনুপম, অনপনেয় বৈচিত্র্য।

আন্তর্জাতিক পরিধান-বাজারে আরমানি-ভারসেচ্চি- কেলভিনক্লেইন, লাকোস্ত, শুচ্চির মতো অতি জনপ্রিয় ও মহার্ঘ ফ্যাশন ব্র্যান্ডের মধ্যে নির্মলতা অনেকটাই নিয়ে এসেছে ভারতের প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল থেকে আসা বস্ত্র-ঐতিহ্যের সাবেকি ও আধুনিক, পরিবর্তনশীল, অভিযোজিত ঘরানার মেলবন্ধন। ভারতের ফ্যাশন ডিজাইনার রাহুল মিশ্র সম্প্রতি হলিউডের প্রখ্যাতা চিত্রাভিনেত্রী জেন্দাইয়াকে সাজিয়েছেন একটি অসাধারণ নীলশাড়িতে। শাড়িটির মধ্যে গাউন, স্কার্ফ ও স্কার্টের ডিজাইনের স্পর্শ আছে। শাড়িটির এম্ব্রয়ডারির মধ্যে আছে কালো আকাশে নক্ষত্ররাজির নকশা, বাঘ, কাঠবেড়ালি, ফ্লেমিংগো পাখির ছবির মধ্য দিয়ে ভারতের সমৃদ্ধ বণ্যপ্রাণীর নিদর্শন। এই ধরনের শাড়ি ক্রমশই বিদেশি মহিলাদের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। রাহুল মিশ্রের ডাকে সাড়া দিয়ে এবং তাঁর ব্যবসা সহযোগী আফজল সাইপুল্লা মোল্লাকে সাহায্য করতে শহর থেকে গ্রামে এসে কারিগররা এই ধরনের শাড়ি বানাচ্ছেন।

হাওড়ার বাঁদপুর ও বড়গাছিয়া গ্রামে এই ধরনের বিশ্বমাণের শাড়ি তৈরি করছেন তাঁতিরা। এঁরা অবশ্য জানেন না— তাঁদের ভাবনা ও কল্পনায় সৃজিত শাড়ি হলিউডের চিত্রশিল্পীদের প্রিয় হয়ে উঠেছে। হয়তো ভবিষ্যতে এই শাড়ি পরবেন কেউ উইন্‌স্লেট, ড্রিউ ব্যারিমোর, ঈভা মেন্দেস, ক্যাথরিন জেটা জোনস-এর মতো হলিউড তারকারা। বড়গাছিয়াতে এই ধরনের বিশ্বমানের শাড়ি তৈরির মধ্যে আরি বা হুক

দেওয়া ছুঁচ এবং সোনার সুতোর কাজ বা জারদৌসির ব্যবহার করা হয়েছে। এই শাড়ি তৈরি করার জন্য দিনে কারিগরদের ১ হাজার টাকা করে পারিশ্রমিক দেওয়া হয়। এই ধরনের শাড়ি প্যারিসের ফ্যাশন শো-তে বেশ নামও করেছে। হাওড়ার এই কারিগরদের মধ্যে অর্ধেক হিন্দু, অর্ধেক মুসলমান। কোভিড অতিমারির সময়ে অবশ্য তাঁদের বস্ত্রবয়নে যথেষ্ট বিঘ্ন ঘটেছিল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মেয়র পদের জন্য প্রার্থী হতে যাচ্ছেন মিসিসিপি মসালা আর সালাম বোম্বে নামক চলচ্চিত্রে সফল পরিচালিকা মীরা নায়ারে সুযোগ্য পুত্র জোহরান জামদানি। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের গোন্দেল আর আদেসার কৃষকদের উৎসাহ দিয়েছেন— উন্নত মানের তুলো উৎপাদন করে তার থেকে কাপড় তৈরি করার সুতো প্রস্তুত করতে। গুজরাটের কচ্ছের রান অঞ্চলে কালাকটন নামে এক বিশেষ ধরনের তুলো উৎপাদন হয়। সেই তুলোর আঁশ কিছুটা খসখসে। বৃষ্টির জলেই পুষ্ট হয় এই তুলো। এই তুলো থেকে তৈরি করা ইন্ডিগো জ্যাকেট জোহরান মামদানি পরছেন। এই তুলোর মধ্যে কোনো কীটনাশক স্প্রে করা হয় না। এই তুলো থেকে হাতে বোনা ডেমিন কাপড় তৈরি হচ্ছে। এই কাপড়ে যে নীলরং ব্যবহৃত হচ্ছে, সেটাও ভারতীয় কারিগরদের নিজের হাতে তৈরি। আকবর বাদশার রাজসভার সভাসদদের মধ্যে অন্যতম আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে গুজরাটের রাজকোট জেলার অন্তর্গত গোন্দাল গ্রামের নাম পাওয়া যায়। কালাকটন তুলো, গোন্দাল গ্রামেও চাষ করা হয়। গোন্দালে 'উদ্যোগ ভারতী'-র মাধ্যমে হরগোবিন্দভাই প্যাটেল নামক একজন স্বউদ্যোগী এই তুলো থেকে বিদেশে রপ্তানিযোগ্য ডেনিস কাপড় তৈরি করছেন। এছাড়া, খাদি কাপড়ও তৈরি হচ্ছে ওই তুলা থেকে। বর্তমানে হরগোবিন্দ ভাইয়ের পৌত্র কাভিন প্যাটেলের নেতৃত্বে উদ্যোগ ভারতীতে ১২০ জন তাঁতি বছরে ২.৫ লক্ষ মিটার কাপড় বুনে চলেছেন।

এই হাতে বোনা খাদি ও ডেনিম সম্পূর্ণভাবে-পরিবেশ বান্ধব এবং জৈব বিয়োজনযোগ্য। গোন্দাল থেকে ৭০ কিলোমিটার দূরের হামাপুর গ্রামেও জগদীশভাই নামক একজন তাঁতি, নীলরঙে চোবানো ডেনিম কাপড় তৈরি করে চলেছেন। একজন তাঁতি দিনে ৬ থেকে ৮ মিটারের মতো কাপড় বোনেন। হামাপুর গির জাতীয় উদ্যানের পরিসীমার অন্তর্গত। এই গ্রামে অনেকসময় সিংহও দেখতে পাওয়া যায়। গোন্দাল থেকে পাঁচ ঘণ্টা দূরত্বে আছে আদেসার। সেখানে 'আদেসার বিস্তার খেত উৎপাদন কোম্পানি লিমিটেড' নামে ২২০ জন কৃষকের এই সুতা উৎপাদন সমবায় গড়ে উঠেছে। উত্তর প্রদেশের মালিহাবাদে দুই বোন— শান্নো ও সাহানা পারভিনের উদ্যোগে চিকন এম্ব্রয়ডারির কাজ করছেন গ্রামের মহিলা তাঁতিরা। সেই চিকনের জ্যাকেট এখন পরছেন 'ওগিলভি অ্যান্ড মাথের-এর চিফ' এক্সিকিউটিভ অফিসার— দেবিকা বালচান্দানি। চিকন এম্ব্রয়ডারি সাধারণত ৩২ রকমের হয়ে থাকে— কাকোরি এলাকার মুররি, বিজলি, কাউরি, বাখিয়া, পেচনি, জালি, ফান্দা, কিল প্রভৃতি।

এছাড়া ধাতব এম্ব্রয়ডারি (কামদানি বা মুকাইশ)-ও উত্তরপ্রদেশে খুব প্রচলিত। বর্তমানে এই ধরনের চিকন এম্ব্রয়ডারি গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে। উত্তরপ্রদেশে বর্তমানে ১ হাজারেরও বেশি মহিলা, চিকন এম্ব্রয়ডারির কাজ করছেন। সাদা জর্জেট ফ্যাব্রিকের ওপর তাঁদের ইন্ডিগো ব্লক প্রিন্টিঙের কাজ সত্যিই প্রশংসার উদ্রেক করে। মোগল স্থাপত্যরীতি অনুসারে জালি ডিজাইনের কাজও করা হচ্ছে উত্তরপ্রদেশের এই চিকন কাপড়ে। চিকন কাপড় ধোওয়া হয় এবং সেখানে ভাতের মাড় বা চারাক দেওয়া হয়। চিকনের কাপড়ের ওপরে বিড্‌স্‌বা পুঁতির কাজ এবং জারদৌজি এম্ব্রয়ডারির কাজ করা হয়। এই কাজে ব্যবহৃত প্লাস্টিকের পুঁতির দাম কেজি প্রতি ২০ টাকা। তবে, দামি কাচের পুঁতির দাম কেজি প্রতি ১৪ হাজার টাকা। চিকন এম্ব্রয়ডারির মধ্যে পেলবতা আনার জন্য সামুদ্রিক শঙ্খের পালিশ দেওয়া হয়। বর্তমানে পৃথিবীর বহু দেশে উত্তরপ্রদেশের চিকন শাড়ির প্রচলন বেশ জনপ্রিয়ভাবেই হয়েছে।

১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের সময় থেকেই উত্তরপ্রদেশের বারাণসী থেকে এক ঘণ্টার দূরত্বে অবস্থিত সেমরা গ্রামে উন্নতমানের বেনারসি শাড়ি তৈরি করা হচ্ছে। এই শাড়ি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হচ্ছে। কালো ও সোনা রঙের চেককাটা বেনারসি শাড়ির জনপ্রিয়তা খুব বেড়েছে গোটা বিশ্বে। ডিজাইনার সঞ্জয় গর্গের উদ্যোগে উত্তরপ্রদেশে বেনারসি, হ্যান্ডলুম সিল্ক ও লিক্রা ব্লেন্ডের শাড়ির বোনার কাজ আরও বাড়ছে। এই ধরনের শাড়ির দুদিকে জরির কাজও করা হচ্ছে। বেনারসি শাড়ির একদিকে সোনালি এবং অন্য দিকে কালো চেনের কাজ করা আছে। ফলে এই ধরনের বেনারসি শাড়ি দুইদিকেই পরা যায়। ক্রমশই এই ধরনের শাড়ি সারাবিশ্বে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। বেনারসি শাড়ি তৈরিতে আরও অনেক মহিলা এগিয়ে আসছেন। বেনারসি শাড়ির মধ্যে রেশম ও লিক্রার সুতো মেশানো হচ্ছে।

সারাবিশ্বে নাম কুড়োচ্ছে তেলেঙ্গানার পোমেপল্লী শাড়ি। এই শাড়িকে ইক্কত নামেও ডাকা হয়। তেলেঙ্গানার পোচমপল্লী, ভোলপুর, সালেম, ভুজ, পালনপুর ও বাড়মেরে এই শাড়ি বোনা হয়। এই শাড়ি সুতো প্রথমে রং করা হয়। তারপর এই সুতো দিয়ে কাপড় বোনা হয়। পোচমপল্লীতে 'শ্রীরঞ্জন উইভ্‌স্‌' নামের একটি সমবায় তৈরি করে শাড়ি তৈরি করাচ্ছেন স্বউদ্যোগী এন্নাম শিবকুমার। তাঁর অধীনে ১০০ জন তাঁতি কাজ করছেন। পাঠান পাতোলা ও সম্বলপুরী শাড়ির মতোই পোচমপল্লির ইক্কতও জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। বর্তমানে একটি পোচমপল্লী শাড়ির দাম শুরু হয় ৯ হাজার টাকা থেকে। এই শাড়ির সুতো তৈরি করার জন্য হায়দরাবাদের রেশমগুটির বাজার থেকে ৫০০ থেকে ৭০০ টাকা কিলো দরে রেশমগুটি কেনা হয়। একটি রেশমগুটি থেকে ১.২৫ কিলোমিটার লম্বা সিল্ক পাওয়া যায়। গুটির ফাঁকা খোলা দিয়ে দিল্লিতে বিশেষ কম্বল বা রাজাই তৈরি হয়। □

কেন্দ্রীয় বাজেট—২০২৬

মূলধনী ব্যয় বৃদ্ধি আগামীদিনে সম্পদশালী ভারতের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করবে

সুদীপ্ত গুহ

যে কোনো সংসারের আয় ও ব্যয়ের যে হিসাব বা 'বাজেট' আমাদের মায়েরা করে থাকেন, তার সঙ্গে দেশের আয় ও ব্যয় বাজেটের একটা মিল রয়েছে। সংসারে দুই রকমের আয় হয়। এক, সংসারের উপার্জনশীল ব্যক্তির উপার্জন। অর্থাৎ চাকুরিরত ব্যক্তির মাইনে অথবা ব্যবসায়ীর ব্যবসা থেকে আয়। দুই, বাড়ি, ঘর বা জমি ভাড়া বা ব্যাংকে জমা রাখা টাকার থেকে সুদ বাবদ আয়। প্রথম আয়টি হলো রেভিনিউ ইনকাম বা রাজস্ব আয়। পরেরটা ক্যাপিটাল ইনকাম বা মূলধনী আয়। ব্যয় বা খরচও দুই প্রকার। এক, রোজকার খরচ, সন্তানদের স্কুল-কলেজের ফি, বাড়ির বিভিন্ন কাজের লোকের মাইনে ইত্যাদি খাতে ব্যয় হলো রেভিনিউ এক্সপেন্ডিচার বা রাজস্ব ব্যয়। দুই, কোনো পরিবার বা কোনো ব্যক্তি যখন জমি, বাড়ি, ফ্ল্যাট, সোনা, শেয়ার বন্ড কেনেন, তখন সেটা ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার বা মূলধনী ব্যয়। মূলধনী ব্যয়ের অর্থ হলো যে ব্যয় কোনো ব্যক্তির স্থায়ী সম্পত্তি বৃদ্ধি করছে। কিন্তু কেন এই স্থায়ী সম্পদ প্রয়োজন? সেই ব্যক্তি এবং তার সন্তানসন্ততি ও পরিবারের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করার জন্য এই স্থায়ী সম্পত্তি প্রয়োজন।

একইভাবে কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রকও দেশবাসী ও আগামী প্রজন্মের ভবিষ্যৎ তৈরির জন্য খরচ করে এই ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার খাতে। মূলধনী ব্যয়ের মাধ্যমে মূলত হয় পরিকাঠামো নির্মাণ, পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং বিভিন্ন স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি, যেমন--- (১) নদী ও সমুদ্র বন্দর (২) সড়কপথ (৩) রেলপথ (৪) পণ্যবাহী রেলপথ (৫) দ্রুতগামী রেল পরিষেবা (৬) মেট্রো রেল প্রকল্প (৭) বিদ্যুৎ কেন্দ্র (৮) বিদ্যুৎ পরিবহণ পরিকাঠামো (৯) বিদ্যুৎ বণ্টন পরিকাঠামো (১০) রিনিউয়েবল্ এনার্জি বা পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উৎপাদন পরিকাঠামো (১১) সাবমেরিন কেবল্ ল্যান্ডিং স্টেশন (ইন্টারনেট পরিষেবা সংক্রান্ত পরিকাঠামো) (১২) বিমানবন্দর (১৩) নতুন নগরী ও উপনগরী (১৪) পানীয় জল প্রকল্প (১৫) বর্জ্য নিষ্কাশন ও পয়ঃপ্রণালী (১৬) ব্রিজ বা সেতু (১৭) মহাকাশ গবেষণা সংক্রান্ত পরিকাঠামো (১৮) টেলিকম পরিষেবা বিষয়ক পরিকাঠামো (১৯) হিমঘর (২০) প্রতিরক্ষা পরিকাঠামো (২১) হাসপাতাল (২২) স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় (২৩) উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা কেন্দ্র (২৪) কারিগরি শিক্ষা কেন্দ্র (২৫) প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন সরকারি দপ্তর ও কার্যালয় স্থাপন (২৫) বিচারব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও বিভিন্ন বিচারবিভাগীয় কার্যালয় নির্মাণ (২৬) সেচ ব্যবস্থা ও নদীবাঁধ প্রকল্প (২৭) জলপথ পরিবহণ সম্পর্কিত পরিকাঠামো (২৮) বন্যা নিয়ন্ত্রণ (২৯) নদী সংযুক্তি (৩০) এবং সবশেষ কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ— বিভিন্ন শিল্প করিডোর।

এই নিয়ে একটানা ন'বার সংসদে অর্থ বাজেট পেশ করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। গত কয়েক বছরে কেন্দ্রীয় অর্থ বাজেটে একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ভারত সরকারের মূলধনী ব্যয় এই কয়েক বছরে পাঁচ লক্ষ কোটি টাকা থেকে বাড়তে বাড়তে এই বছর প্রায় সাড়ে বারো লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছে গিয়েছে। কেন এতটা মূলধনী ব্যয় বাড়ালেন নির্মলাজী? পৃথিবীর ছয় ভাগের এক ভাগ মানুষ ভারতে বসবাস করে, কিন্তু গোটা পৃথিবীর সম্পদের মাত্র ৪ শতাংশ রয়েছে আমাদের দেশে। তাই পশ্চিমি দেশের তুলনায় দরিদ্র এই দেশ। একসময় পৃথিবীর ৩৩ শতাংশ সম্পদের অধিকারী ছিল ভারতবর্ষ। কিন্তু এক হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে লুঠতরাজ ও অপশাসন ভারতকে পিছিয়ে দেয়। আজ থেকে ৩০০-৪০০ বছর আগেও ডাচ, পর্তুগিজ, দিনেমার, ফরাসি, ব্রিটিশরা তাদের সাম্রাজ্য তৈরির জন্য যে অর্থের প্রয়োজন, সেটা মিটিয়েছে তাদের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিগুলির থেকেই। ১৯৪৭-এ রাজনৈতিক স্বাধীনতা এলেও ভারতের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আসে ১৯৯১-তে। ১৯৯১ সাল থেকে শুরু করে ২০০৪ সাল পর্যন্ত নরসিমহা রাওজী ও অটলবিহারী বাজপেয়ীজীর সাহসী নেতৃত্বে সারা পৃথিবীর পরিষেবা ক্ষেত্র ধরে নেয় ভারত। কারণ ভারতীয়দের উচ্চ মেধা এবং পাঁচ হাজার বছরের যুক্তিভিত্তিক শিক্ষার ঐতিহ্য। কিন্তু সময়ের সঙ্গে কিছুটা পিছিয়ে গিয়েছিল ভারতীয় কৃষি, উৎপাদন শিল্প ও গবেষণা ক্ষেত্র। ২০১৪ সালে মোদীজী ক্ষমতায় এসে ঘোষণা করেন 'মেক ইন ইন্ডিয়া' প্রকল্প। দেশজুড়ে ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পে জোর দেওয়ার ফলে বিভিন্ন পণ্য উৎপাদন শুরু হয়। এর ফলে ধীরে ধীরে আমদানি-নির্ভরতা কমে। কৃষিতে বিশেষ জোর দেওয়া হয়। গবেষণার ক্ষেত্রেও গুরুত্ব দেয় কেন্দ্র।

সমুদ্র উপকূলবর্তী রাজ্যগুলি খুব তাড়াতাড়ি এর ফল পায় এবং এগিয়ে যায়। একমাত্র পশ্চিমবঙ্গ বাদে গুজরাট, মহারাষ্ট্র, পুরো দক্ষিণ ভারত ও ওড়িশায় এই উন্নতি

বিশেষ লক্ষণীয়। কিন্তু বাকি রাজ্যগুলি কীভাবে তাদের কৃষি ও পশুপালনজাত পদার্থ, দুগ্ধজাত পদার্থ, মৎস্য ইত্যাদি বিদেশে রপ্তানি করবে? উপকূলবর্তী রাজ্যগুলিতে প্রাপ্ত সুযোগসুবিধা ছেড়ে কেন অন্যান্য রাজ্যগুলিতে শিল্পে বিনিয়োগ করবেন একজন শিল্পপতি বা ব্যবসায়ী? এখানেই উঠে আসে পরিকাঠামোর প্রয়োজনীয়তা। মোদীজীর লক্ষ্য হলো দেশজুড়ে এমন যোগাযোগ ব্যবস্থা, টেলিকম ও ইন্টারনেট সম্পর্কিত পরিকাঠামো, হিমঘর ইত্যাদি আগরতলা, বিলাসপুর, কোচবিহার বা হিমাচল প্রদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে থাকবে, যাতে সেখানেও কোনো না কোনো বিনিয়োগ হয়। এবং এই প্রক্রিয়ায় দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে উত্তর, উত্তর-পূর্ব ও পূর্ব ভারতের আর্থিক ও সামাজিক দূরত্ব কমে। এর সঙ্গে দেশবাসীর জীবন ও জীবিকার মান বাড়ে। আজও মুম্বইয়ের জিডিপি পুরো উত্তরপ্রদেশের থেকে বেশি। এমন বৈষম্য দূর করতে হলে প্রয়োজন সব রাজ্যে সমান পরিকাঠামো।

প্রধানমন্ত্রী মোদীজী নির্মলাজীকে কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রকের দায়িত্ব দেওয়ার পর থেকেই উপরোক্ত ৩০টি বিভাগের সবক'টি ক্ষেত্রেই বিপুল অর্থ বরাদ্দ করেছে কেন্দ্র। ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের বাজেটে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো ৪০০০ কিলোমিটার হাই-স্পিড ট্রেনের জন্য সাতটি রেল করিডোর। এগুলি হলো— মুম্বই-পুনে, পুনে-ভাগ্যনগর, ভাগ্যনগর-বেঙ্গালুরু, ভাগ্যনগর-চেন্নাই, চেন্নাই- বেঙ্গালুরু, দিল্লি-বারাণসী ও বারাণসী-শিলিগুড়ি। এই রেল করিডোর স্থাপনের উদ্দেশ্য হলো যাতায়াতের সময় কমানো এবং ব্যবসা ও পর্যটন বাড়ানো।

প্রশ্ন হলো, শিলিগুড়িকে যুক্ত করলেও কেন বাদ কলকাতা? উত্তর হলো কলকাতা-সহ গোটা পশ্চিমবঙ্গকে বিভিন্ন প্রকল্পে গত ১১ বছরে বহু টাকা বরাদ্দ করেছে কেন্দ্রীয় সরকার, যা খরচ করতে দেয়নি রাজ্য সরকার। বহু প্রকল্প শুরুই করা সম্ভবপর হয়নি, কিছু প্রকল্প শুরু হলেও পরে অর্ধেক কাজ হয়ে পড়ে রয়েছে। প্রায় কাজ হয়নি এমন অনেকগুলি প্রকল্প পশ্চিমবঙ্গে রয়েছে। তিস্তা প্রকল্প, মোড়গ্রাম-হলদিয়া বন্দর সংযুক্তি সড়ক, গভীর সমুদ্র বন্দর, লুধিয়ানা-ডানকুনি পণ্যবাহী রেল (ফ্রেট) করিডোর, মুম্বই-হাওড়া পণ্যবাহী রেল করিডোর, বিভিন্ন বিদ্যুৎ প্রকল্প, অমৃতসর-কলকাতা শিল্প করিডোর, ইস্ট কোস্ট শিল্প করিডোর, সুন্দরবনের আইলা প্রকল্প, হলদিয়ায় সাবমেরিন কেবল্ ল্যান্ডিং স্টেশন, ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান, রাজ্যের সব জাতীয় ও রাজ্য সড়ক সম্প্রসারণ, রাজ্যের সব মেট্রো রেল প্রকল্প, কলকাতা ও বাগডোগরা বিমানবন্দর সম্প্রসারণ, বারাণসী-হলদিয়া এক্সপ্রেস রোড, কোচবিহার-কলাইকুণ্ডা-বালুরঘাট বিমানবন্দর-সহ অসংখ্য উদাহরণ দেওয়া যায় যে প্রকল্পগুলির কাজ শুরু হয়নি অথবা শুরু হলেও রাজ্য সরকারের অনীহায় থমকে রয়েছে। বহু প্রকল্প জমিজটে আটকে রয়েছে। বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় জমি দেয়নি পশ্চিমবঙ্গ সরকার। কিছু প্রকল্পে কেন্দ্র অর্থ বরাদ্দ করলেও সেই প্রকল্পে তাদের প্রদেয় অর্থ দিতে পারেনি রাজ্য। এই সমস্ত প্রকল্পগুলি যদি রাজ্য হতে দিত, তবে একজন বাঙ্গালিও আজ পরিযায়ী শ্রমিক হতো না, যেমন হয় না আজ ওড়িয়া বা অসমীয়ারা।

আজ ভারত তার ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার বা মূলধনী ব্যয় বাড়াচ্ছে আগামী ১০০ বছরের কথা ভেবে। বর্তমানে বিশ্বের চার নম্বর অর্থনীতি হলো ভারত। ২০৪৭ সালের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী মোদীজীর স্বপ্ন হলো— 'বিকশিত ভারত'। উন্নত দেশ হওয়ার সঙ্গে ভারতবর্ষ পুনরায় অধিষ্ঠিত হতে চলেছে বিশ্বগুরুর আসনে। সেই লক্ষ্য নিয়েই পরিচালিত হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের এই মহতী কর্মযজ্ঞ। যার ফল এর মধ্যেই পেতে শুরু করেছে গোটা দেশ। মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে ইউরোপীয় ইউনিয়নও আজ ভারতের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছে। বর্তমান ভারত বিশ্ব রাজনীতি ও আন্তর্জাতিক অর্থনীতির চালকের আসনে থাকার কারণে শুল্ক যুদ্ধে কিঞ্চিৎ ইতি টেনে টারিফ কমিয়ে ১৮ শতাংশে এনেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। 'ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে'— সেই লক্ষ্যের দিকে ধাবিত হওয়ার উদ্দেশ্যেই তৈরি হচ্ছে ভারত সরকারের যাবতীয় পরিকল্পনা। □

এবারের কেন্দ্রীয় বাজেট রাজ্যের অগ্রগতির সহায়ক

ড. পঙ্কজ কুমার রায়

আন্তর্জাতিক অস্থির রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে ২০২৬-২০২৭ অর্থবর্ষের কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করলেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। নবমবার বাজেট পেশ করে প্রণব মুখার্জি, পি চিদাম্বরম, যশবন্ত সিন্‌হা, যশবন্ত সিংহ রেকর্ড অতিক্রম করে মোরারজী দেশাইয়ের রেকর্ড স্পর্শের লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছেন। ২০২৬ কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ হলো বিশ্বজোড়া জটিল অস্থির পরিস্থিতির বাতাবরণে। একদিকে আর্থিক স্থিতিশীলতা অন্যদিকে গ্রহণযোগ্য পরিকল্পনার মাধ্যমে দীক্ষিত ভারতের লক্ষ্যে এক কদম এগিয়ে গেল ভারত। শুল্কযুদ্ধ, বহুমুখী বাণিজ্যিক বৈচিত্র্যের মধ্যে দাঁড়িয়ে ভারত ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে স্বাক্ষরিত হলো 'মাদার অব অল ডিলস্'। এর ফলে ভারতের সমপরিমাণ ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাজার উন্মুক্ত হলো ভারতের জন্য। আর্থিক বৃদ্ধিতে ভারত পৃথিবীর অগ্রসর দেশগুলি থেকে অনেকটা এগিয়ে ৬.৮—৭.২ শতাংশ উন্নয়নের হার বজায় রাখতে পেরেছে। পরবর্তী অর্থবর্ষে তা ১০ শতাংশ ছুতে পারবে বলে অর্থমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেছেন।

যেখানে পশ্চিমবঙ্গের বাজেটগুলিতে বিগত বছরগুলিতে মূলধনী ব্যয় চলতি খাতে ব্যয়ের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে রাজ্যবাসীকে ভ্রান্তিবিলাসে নিমজ্জিত করে, সেখানে ২০১৫-২০১৬ অর্থবর্ষে কেন্দ্রীয় বাজেটে মূলধনী ব্যয় ২ লক্ষ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ২০২৬-২০২৭ অর্থবর্ষে দাঁড়াবে ১২.২ লক্ষ কোটি টাকা অর্থাৎ ৬ গুণ বেশি, যা দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন, কর্মসংস্থান ও প্রগতির সহায়ক হবে।

দ্বিতীয়ত ষোড়শ অর্থ কমিশনের সুপারিশ অনুসারে রাজ্যগুলির বরাদ্দ ৪১ শতাংশ করা হয়েছে, ইউপিএ সরকারের আমলে যা ছিল ৩৪ শতাংশ। বামেদের সেরা ছাত্রীর রাজ্যকে বঞ্চনার অভিযোগ তাই ভিত্তিহীন। রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির জন্য কেন্দ্রীয় বরাদ্দ ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে ছিল ১৮.৭ লক্ষ কোটি টাকা, যা ২০২৬-২০২৭ অর্থবর্ষে দাঁড়াবে ২৬.২ লক্ষ কোটি টাকা যা বিগত বছরের ২৩.৪ লক্ষ কোটি টাকা থেকে প্রায় ৩ লক্ষ কোটি টাকা বেশি।

ডানকুনি-সুরাট ফ্রেট করিডোর, দুর্গাপুর-পূর্বোদয় শিল্প করিডোর, দিল্লি-বারাণসী-শিলিগুড়ি দ্রুতগতিসম্পন্ন রেল করিডোর, যোগাযোগভিত্তিক ২০টি বিশেষ জলপথ এবং পূর্বোদয় উদ্যোগের অধীনে পর্যটন শিল্প ও বিভিন্ন শহরের জন্য ৪০০০ ই-বাসের ঘোষণা অর্থনীতিতে গতি সঞ্চার করবে।

পশ্চিমবঙ্গের ২৩টি জেলা বালিকাদের জন্য ২৩টি হস্টেল পাবে। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ডিজাইন প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে পূর্ব ভারতের চাহিদা পূরণ হবে। ৫টি বিশ্ববিদ্যালয় ভিত্তিক টাউনশিপে রাজ্য উপকৃত হবে। মেট্রো রেল কলকাতার হার্টলাইন। অরেঞ্জ লাইনের জন্য ৭০৫.৫ কোটি টাকা, পার্পল্ লাইনের জন্য ৯০৬.৫ কোটি টাকা এবং গ্রিন লাইনের জন্য ৫২৯ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। পাঁচটি রাজ্যে মেডিক্যাল ট্যুরিজম প্রকল্পের আওতায় পশ্চিমবঙ্গের সরকারি হাসপাতালগুলির প্রাধান্য বৃদ্ধি পাবে।

জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার জন্য ১০১৮ কোটি টাকা বরাদ্দ, টি-বোর্ডের জন্য ৩৮০ কোটি টাকা বরাদ্দ। ভ্যারিয়েবল্ এনার্জি সাইক্লোট্রন সেন্টারের জন্য ৪৮৬ কোটি টাকা। ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পোর্টের জন্য ১৫০ কোটি টাকা, ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসক্যাল ইনস্টিটিউটের জন্য ৩৩২ কোটি টাকা, সত্যজিৎ রায় ফিল্ম ইনস্টিটিউটের জন্য ৯০ কোটি টাকা, বেঙ্গল কেমিক্যালসের জন্য ২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো বিগত বছরগুলিতে রাজ্য বাজেটের ৪০ শতাংশ আসে রাজ্যের নিজস্ব কর ও রাজ্যের সম্পদ থেকে। ৫৬ শতাংশ আসে কেন্দ্র থেকে পাওয়া রাজ্যে করের ভাগ ও কেন্দ্র থেকে পাওয়া গ্রান্ট ইন এড থেকে। 'পশ্চিমবঙ্গ সরকার ২০১৯ থেকে ২০২৪-এই পাঁচ বছরের মধ্যে ৫ লক্ষ ৫৬ হাজার কোটি টাকা কেন্দ্রের কাছ থেকে পেয়েছে'— স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা প্রকাশ্য জনসভায় এই তথ্য দেন। কেন্দ্রীয় সরকারি তথ্য অনুযায়ী, ২০০৪ থেকে ২০১৪— ১০ বছর কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন ইউপিএ সরকারের থেকে পশ্চিমবঙ্গ পেয়েছিল ২.০৯ লক্ষ কোটি টাকা। ২০১৪ থেকে ২০২৪— নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের আমলে পশ্চিমবঙ্গ পেয়েছে ৮.২৭ লক্ষ কোটি টাকা।

এতদ্‌সত্ত্বেও, ২০১১ সালের রাজ্যের ঋণের পরিমাণ ১ লক্ষ ৮৬ হাজার কোটি টাকা থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮ লক্ষ কোটি টাকা। অথচ পশ্চিমবঙ্গের মাথাপিছু আয় ১৯৭৭ সালে ৬২৬ টাকা (তৃতীয়), ২০১১ সালে ৫১ হাজার ৩৫৭ টাকা (১০ম) এবং ২০২৫ সালে ২ লক্ষ ৪ হাজার ৭৮১ টাকা (২১তম স্থানে)। বর্তমানে রাজ্য সরকারি ও সাহায্যপ্রাপ্ত সংস্থার কর্মীরা ১৮ শতাংশ ডিএ পান আর ৩৬ শতাংশ ডিএ পান না। টাকাগুলো সব গেল যে কোথায়? বঞ্চনা নয়, অপচয় ও আত্মপ্রসাদে আমরা পথভ্রষ্ট হয়ে অতল গহ্বরে পৌঁছে যাচ্ছি। বঞ্চনার কথা বলে নয়, অর্থনীতির চাকা ঘুরিয়ে এ রাজ্যকে উন্নয়নের রাস্তায় হাঁটতে হবে।

(লেখক অধ্যক্ষ, যোগেশচন্দ্র চৌধুরী কলেজ)

হিন্দু রক্তে হালাল বাংলাদেশ !

সুভাষ চক্রবর্তী

পুকুরের জলে ভাসছে মৃতদেহ। খাল, বিল, ঝিল, নদীর জলেও মৃতদেহ। পথে ঘাটে মৃতদেহ। হিন্দু মৃতদেহের মিছিল! বাড়িঘর লুঠ, চাষের জমি, শ্মশান ও দেবোত্তর জমি জবরদখল। পূজিত দেবদেবীর মূর্তি ভাঙচুর। মন্দির, বাড়ি, ঘরে অগ্নিসংযোগ প্রতিদিনের ঘটনা। হিন্দু নারী অপহরণ, বলাৎকার, বাধা দেবে কে? ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে ধর্মান্তর ঘটেই চলেছে। হিন্দু কোতলের রক্তে চলছে জেহাদিদের গোসল। শিক্ষা, ব্যবসা, চাকরিক্ষেত্রে চরম বৈষম্য। চাকুরিজীবী হিন্দুদের ভাগ্য ও জীবন জেহাদিদের জালে বন্দি।

নাজেল হওয়া আসমানি কিতাবের নির্দেশে চলে বান্দা। হিন্দু ঘরে সুন্দরী বোন, কন্যা, গৃহবধূ থাকলে জেহাদিদের নিয়মিত জিজিয়া কর প্রদান বাধ্যতামূলক। ইসলামি বাংলাদেশ এখন জেহাদিদের মুক্ত বিচরণ ক্ষেত্র। বাংলাদেশে হিন্দু মানেই 'না-পাক' জীব। তাই জেহাদিদের স্লোগান হলো— হিন্দু তাড়াও, পাক-বাংলাদেশ বানাও। এই বছর জানুয়ারি মাসে ৫১ জন হিন্দু কোতলের শিকার। দিনে মধুমাখা শব্দ দিয়ে ভাষণ। রাতের অন্ধকারে অমানবিক নির্যাতন। বাংলাদেশের বেঁচে থাকা হিন্দুদের জীবন এক কঠিন যন্ত্রণা। ভারতে বসে দূর থেকে তা কতটা উপলব্ধি করা সম্ভব? বাংলাদেশ হিন্দুশূন্য করার জন্য ডলার, পেট্রোডলার আসে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ থেকে। সঙ্গে রয়েছে তুরস্ক- পাকিস্তান-সহ বিশ্ব ইসলামি ভ্রাতৃত্ব। বাংলাদেশের উপাসনা পদ্ধতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে প্রতি বছর চলে ধর্মান্তরিত হিন্দু অর্থাৎ নও মুসলমানদের মোটা অঙ্কের টাকা ভাতা প্রদান। এসব টাকার বড়ো অংশ জামায়াতের হাত ধরে বাংলাদেশে প্রবেশ। এই টাকায় শুধুমাত্র ঢাকা শহরে ১৫ হাজার সাইবার কাফে এবং সমগ্র বাংলাদেশে অসংখ্য মাদ্রাসা, মক্তব, এতিমখানা জামায়েত দ্বারা পরিচালিত। জান্নাত যেতে আগ্রহী মাদ্রাসা ছাত্র-ছাত্রীদের একাংশ নিয়ে গঠিত হয় জেহাদি, সন্ত্রাসী, আত্মঘাতী বাহিনী। বহু বছর আগে থেকেই সন্ত্রাসবাদীরা বাংলাদেশে স্লোগান তুলেছে— 'আমরা সবাই হবো তালিবান, বাংলা হবে আফগানিস্তান!' প্রায় আড়াই হাজার বাংলাদেশি জেহাদি তালিবানের পক্ষ নিয়ে জেহাদ করছে আফগানিস্তানে। শোনা যায় আরও কয়েক হাজার আত্মঘাতী জঙ্গি বাংলাদেশ জামায়াতের স্টকে রয়েছে। এরাই হেফাজতে ইসলাম, চরমোনাই, তৌহিদি জনতা অনুগামীদের নিয়ে হিন্দুমুক্ত বাংলাদেশ গঠনে সক্রিয়। আরাকান দেশ গঠনের লক্ষ্যে সক্রিয় মায়ানমারের রোহিঙ্গা লিবারেশন অর্গানাইজেশনও এদের অর্থ ও অস্ত্রে মদতপুষ্ট। বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী উত্তর- পূর্ব ভারতের কয়েকটি রাজ্যে বাংলাদেশি জামায়াতের অর্থে মাঝে মধ্যেই অশান্তির আগুন জ্বলে ওঠে। তথাপি বিশ্ব মোড়ল মার্কিনদের এক নম্বর পছন্দের তালিকায় জামায়াত। ভারতে বাংলাদেশি মুসলমান ও রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ হলো জামায়াতেরই তৈরি পরিকল্পনা।

এই উপমহাদেশে ভারত হলো উর্বর ক্ষেত্র। সেকুলার বুদ্ধিজীবী ও নেতাদের বদান্যতায় জামায়াতের শাখা-প্রশাখা পশ্চিমবঙ্গ, অসম, ত্রিপুরা, মেঘালয়, মণিপুর, মিজোরাম, অরুণাচল প্রদেশে হয়েছে বিস্তৃত। এছাড়াও ভারতের অন্যত্রও তাদের গোপন কাজকর্ম চলছে দীর্ঘদিন। পশ্চিমবঙ্গে বাংলাদেশি অনুকরণে দুর্গাপূজা বন্ধ, প্রতিমা ভাঙচুরের মাধ্যমে চলছে নানান পরীক্ষানিরীক্ষা। ওরা জেহাদ করে ১৯৪৭-এ পেয়েছে পাকিস্তান। বর্তমানে বাংলাদেশে চলছে ওদের নির্দেশেই পরিচালিত সরকার। পাকিস্তান-তুরস্ক খালাতো ভাই। চিন্তার কোনো কারণ নাই। জান্নাত পেতে জেহাদ চাই। বাংলাদেশ গঠনের সময় হিন্দু রক্তে হালাল হয়েছে পাকিস্তান। তার ধারাবাহিকতা আজও চলছে। নদীর জলে ভেসে চলা শত শত হিন্দু মৃতদেহের কেউ হিসাব রাখে না। প্রাণভয়ে লুকিয়ে থাকে নিহতর আত্মীয় পরিজনরা। মৃতদেহ চিহ্নিত করলেই তার অবস্থা যে অনুরূপ হবে। রাজনৈতিক অচৈতন্য, সামাজিক ঐক্যহীনতা, পলায়ন প্রবৃত্তি ভূমিপুত্র পূর্ববঙ্গীয় হিন্দুদের ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছে। বাংলাদেশের সংসদে ক্ষীণ প্রতিনিধিত্ব তাদের ক্ষমতাহীন করে দিয়েছে। পূর্ব পাকিস্তান, বাংলাদেশে হিন্দুরা কোনোদিনই জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা পায়নি। ভবিষ্যতেও পাবে না। সেখানকার সরকারি ভাষ্য হিন্দুদের সঙ্গে প্রতারণা মাত্র। হিন্দু জনসংখ্যা আজ বাংলাদেশে নির্মূলের পথে। জেহাদি সন্ত্রাসে হিন্দুদের জীবন বিপন্ন। সন্ত্রাস ও শান্তির সহাবস্থান হতে পারে না। এ বিষয়ে বিশ্ব মানবতাকে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। এথনিক ক্লিনজিং বন্ধ করে বাংলাদেশের হিন্দুদের চিরস্থায়ী, নিরাপদ বসবাসের জন্য ব্যবস্থা করতে হবে— এটাই আজ সময়ের দাবি। মুজিব থেকে ইউনুস সরকার কেউ তাকায়নি হিন্দুদের দিকে। তাদের সম্পদ হলো গনিমতের মাল। হিন্দুদের জীবন এখন কোতলের শিকার। ভারতে চলে আসার পথ চিরতরে বন্ধ। সাধের বাংলাদেশ এখন হিন্দু বিদ্বেষের দেশ। সামরিক, আধা-সামরিক বাহিনী, প্রশাসন, অফিস, আদালত--- সর্বত্রই চলছে ইসলামীকরণ ও জেহাদীকরণ। ভারত বিদ্বেষ ওয়াজ মাহফিলের অংশ। হুমকি ধমকি জেহাদিদের স্বভাবজাত। জেহাদিরা আনন্দে আত্মহারা।

বিধাতাই জানেন বাংলাদেশে হিন্দুদের অস্তিত্ব থাকবে কিনা! না কিহিন্দু কোতলের রক্তে হালাল হবে বাংলাদেশ? □

শীতের দুপুরে এক টুকরো প্রাণ

শীতের এক নরম দুপুর। রোদটা তখন কুয়াশা ছিঁড়ে মাটিতে নামছে। আমি আর মা বাগানের ভেতরে ধীরে ধীরে হাঁটছিলাম। চারপাশে শুকনো পাতার মচমচ শব্দ, গাছের ডালে ডালে শীতের নিশ্চুপতা— সব মিলিয়ে এক শান্ত, নিশ্চিন্ত মুহূর্ত।

হঠাৎ সেই শান্তি ভেঙে গেল। গাছের উপর থেকে থপ্ করে কিছু একটা পড়ে যাওয়ার শব্দ। চমকে উঠে সামনে এগিয়ে যেতেই বুকটা কেঁপে উঠল। দেখি, একটি ছোট্ট কাঠবেড়ালি মাটিতে পড়ে আছে। একটি নিষ্ঠুর কাক তার শক্ত ঠোঁট দিয়ে তাকে ঠুকরে দিয়েছে। ওর ছোট্ট গলাটা রক্তে ভিজে লাল হয়ে গেছে। থর থর করে কাঁপছে তার শরীরটা।

দৃশ্যটা দেখে আমার দুচোখ জলে ঝাপসা হয়ে এল। বুকের ভেতরে একটা অজানা ভয় আর কষ্ট একসঙ্গে চেপে বসল। কিছু না ভেবেই দৌড়ে ওর কাছে গেলাম। হাতের বইটা মাটিতে রেখে খুব সাবধানে কাঠবেড়ালিটাকে তুলে নিলাম। যেন একটু ভুল হলেই ওর প্রাণবায়ু বেরিয়ে যাবে।

তারপরেই ছুটে গেলাম বাবার কাছে। আমার বাবা একজন শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী। সেই মুহূর্তে আমার একটাই বিশ্বাস, বাবা পারবে, বাবা নিশ্চয় পারবে ওকে বাঁচাতে। কাঁপা গলায় সব বললাম।

বাবা এক মুহূর্তও দেরি করলেন না। খুব যত্ন করে কাঠবেড়ালিটাকে হাতে নিলেন। তুলো দিয়ে তার ক্ষত পরিষ্কার করে দিলেন। তারপর আলতো করে ওর শরীরটা মুছে দিলেন। বাবার মুখমণ্ডলে এক অদ্ভুত মমতা বিরাজ করছিল, যেন বিজ্ঞান আর স্নেহ একসঙ্গে কাজ করছে।

কিছুক্ষণ পরেই কাঠবেড়ালিটার শরীর একটু নড়ে উঠল। তার নিস্তেজ শরীরে প্রাণের ঝিলিক দেখা গেল। ধীরে ধীরে চোখ খুলল। তারপর বাবার হাতে সোজা হয়ে বসল।

সেই মুহূর্তে আমার বুক ভরে গেল এক গভীর শান্তিতে। মনে হলো, আজ শুধু একটি ছোট্টো প্রাণই নয়, আমার ভেতরের ভয়, অসহায়ত্ব আর অস্থিরতাও যেন দূরে চলে গেল।

শীতের সেই দুপুরটা আমার জীবনে চিরদিনের জন্য উষ্ণ হয়ে রয়ে গেল।

ত্রিশান মজুমদার,
অষ্টম শ্রেণী,
ভাটনগর আন্তর্জাতিক বিদ্যালয়,
বসন্ত কুঞ্জ, নতুন দিল্লি।

জাতীয় উদ্যান

কালেসার

কালেসার জাতীয় উদ্যান হরিয়ানা রাজ্যের যমুনানগর জেলায় অবস্থিত। এটি ২০০৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। উদ্যানের ভেতরে অবস্থিত কালেসার মহাদেব মন্দিরের নামানুসারে নামকরণ হয়েছে। উদ্যানটি ১৩ হাজার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। উদ্যানটি বন, বন্যপ্রাণী এবং সুন্দর সুন্দর পাখিতে ভরা একটি শান্ত ও সবুজ স্থান। হরিয়ানার একমাত্র শালবৃক্ষ বন এই উদ্যান। এখানে একটি ভেষজ উদ্যানও আছে। জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত উদ্যান বন্ধ থাকে। বাকি মাসগুলিতে গ্রীষ্মকালে পরিদর্শনের সময় সকাল ৬টা থেকে ১০টা এবং বিকেল ৪টা থেকে ৭টা। শীতকালে সকাল ৭টা থেকে ১১টা এবং বিকেল ৩.৩০ থেকে সন্ধ্যা ৬টা।

এসো সংস্কৃত শিখি-৯৯

পঞ্চমী বিভক্তি: (ভাগ: - ২)

.... **তঃ**। **কুত: ?**

... থেকে। কোথা থেকে ?

হস্তত: - হাত থেকে। **গ্রামত:** -গ্রাম থেকে।

গৃহত: - বাড়ি থেকে। **মন্দিরত:** -মন্দির থেকে।

পেটিকাত: -বাক্স থেকে। **কলিকাতাত:** - কলকাতা থেকে।

কূপীত: - বোতল থেকে। **কাশীত:** - কাশী থেকে।

দণ্ড হস্তত: পততি। লাঠি হাত থেকে পড়ছে।

দণ্ড কুত: পততি ? লাঠি কোথা থেকে পড়ছে?

যোগাযোগ–

(১) শ্রী সন্তু দত্ত, সংস্কৃতভারতী, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সম্পাদক।

৯৮৭৪৬৮০৩১৩।

(২) শ্রীজয় সাহা,সংস্কৃতভারতী, উত্তরবঙ্গ প্রান্ত সম্পাদক।

৭৫০১৪৩৮৯৪৯।

ভালো কথা

বনভোজনের অভিজ্ঞতা

গত ১৮ জানুয়ারি আমি বাবা-মা'র সঙ্গে প্রান্তকথার বনভোজনে গিয়েছিলাম। সেখানে খুব আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে নতুন কিছু শিখেছি। আমরা সবাই শিয়ালদা থেকে ট্রেনে বজবজ গেলাম। তারপর স্টিমারে গঙ্গার ওপারে বাউরিয়া জুট মিলের গেস্ট হাউজে পৌঁছালাম। খুব শান্ত মনোরম পরিবেশ, চারদিকে ফুলের বাগান। পাশে মা গঙ্গা। তাতে অনেক বড়ো বড়ো পণ্যবাহী জাহাজ দেখলাম। সকালের জলখাবার খেয়ে সবাই মিলে নানা রকম খেলায় মেতে উঠলাম। এরকম মজার খেলা আমি আগে কখনো খেলিনি। তারপর বুদ্ধির খেলা, গান, অন্ত্যাক্ষরী, আবৃত্তি হলো। দুপুরে বেশ মজা করে খাওয়াদাওয়া হলো। সব মিলে সারাদিন খুব আনন্দে কাটলো। আগামী বছর আবার বনভোজনের অপেক্ষায় রইলাম।

সোনাক্ষী চৌধুরী, নবমশ্রেণী, লরেটো ডে স্কুল, বৌবাজার, কল-৫৯

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে	*সঠিক ভাবে সাজাতে হবে*
(১) ঙ্গ লা অ ম	(১) জা জ ড়ো হা উ
(২) লা প ভো আ	(২) ত্র ত্ত প র উ

১৯ জানুয়ারি সংখ্যার উত্তর

(১) লতাবিতান (২)তারামণ্ডল/লতামণ্ডপ

১৯ জানুয়ারি সংখ্যার উত্তর

(১) উচ্চকুলজাত (২) ইতিহাসবিদ

(১) হৃতিকা মণ্ডল, জয়শ্রী, বাঁশদ্রোণী, কল-৭০। (২) কৃতিকা মণ্ডল, মকদুমপুর, মালদা। (৩) যুথিকা সরদার, ক্যানিং, দঃ ২৪ পরগনা। (৪) পূজা সেন, ঝালদা, পুরুলিয়া।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/ সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯

ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪ ৯০৫১৭২১৪২০

PIONEER®
EXERCISE BOOK

Manufacturer of Exercise Book
& Office Stationery

PIONEER PAPER & STATIONERY PVT. LTD.
74, Beliaghata Main Road, Kolkata 700 010 India. Phone +91 33 2370 4152 / 2373 0550. Fax +91 33 2373 2596
Email pioneerpaperco@gmail.com. www.pioneerpaper.co

নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রুপ দিন

মিউচুয়াল ফান্ডে SIP করুন

(সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান)

কি জন্য করবেন?

- ★ RETIREMENT PLANNING.
- ★ CHILDREN EDUCATION FUND.
- ★ DAUGHTER MARRIAGE FUND.
- ★ WEALTH CREATION.
- ★ ANY OTHER SHORT & LONG TERM PLAN

DRS INVESTMENT 8240685206
9748978406

Email: drsinvestment@gmail.com || Website: www.drsinvestment.com

NPS | Mutural Fund | Insurance | Mediclaim | Fixed Deposit | Bond

কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৬-২৭

শক্তিশালী আত্মনির্ভর বিকশিত ভারতের কয়েকটি দৃঢ় পদক্ষেপ

বিমলশঙ্কর নন্দ

স্বাধীনতার পর থেকে বিগত শতাব্দীর ৯০-এর দশক পর্যন্ত সময়কালে কেন্দ্রীয় বাজেট ঘোষণার দিন মানুষ উৎকণ্ঠার সঙ্গে একটি বিষয় জানতে রেডিয়োতে কান পাততো কিংবা পরবর্তীতে যখন ভারতে টেলিভিশনের সম্প্রচার শুরু হয় তার পর্দায় চোখ রাখতো। সেটি হলো কোন জিনিসের দাম বাড়ছে আর কোন জিনিসের দাম কমছে। বাজেট যে দেশের আর্থিক ভবিষ্যৎ গঠনের এক শক্তিশালী হাতিয়ার হতে পারে, বাজেটের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিকে একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার মাধ্যমে সেই লক্ষ্যে চালিত করা যায় তা কখনো দেশের মানুষের কাছে প্রতিভাত হয়নি। ১৯৯১ সালে তৎকালীন অর্থমন্ত্রী ড. মনমোহন সিংহ সংসদে যে বাজেট পেশ করেন তাতে প্রথমবারের জন্য ভারতীয় অর্থনীতির কাঠামোগত পরিবর্তনের সম্ভাবনা সূচিত হয়। ১৯৮৯-৯১ সময়কালে উপসাগরীয় অঞ্চলে সংকট এবং ভারতীয় অর্থনীতির ওপর এর মারাত্মক প্রভাব, বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয় প্রায় শূন্যে পৌঁছে যাওয়া, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চালিয়ে যেতে ব্যাংক অব ইংল্যান্ডে ভারতের সোনা গচ্ছিত রাখা প্রভৃতি ঘটনাবলী ভারতের অর্থনীতিতে এক ভয়ঙ্কর বিপর্যয়ের ইঙ্গিতবাহী ছিল। মনমোহন সিংহের ১৯৯১ সালের বাজেট ছিল সেই অর্থনীতিকে বাঁচিয়ে রাখার এক মরিয়া প্রচেষ্টা। এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে পিভি নরসিমহারাওয়ের প্রধানমন্ত্রিত্বকালে ভারতীয় অর্থনীতিতে কাঠামোগত পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল তাঁর বাজেটের মাধ্যমে।

উদার অর্থনীতির মূল ভাবনাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বহু দেশ ইকনমিক প্রোটেকশনিজম বা অর্থনৈতিক সুরক্ষাবাদের আশ্রয় নিচ্ছে। বিশ্বায়নের যুগে এই সবকিছুই ভারতকে প্রভাবিত করছে। এই নিদারুণ সময়ের প্রেক্ষাপটে নির্মলা সীতারামনের পেশ করা বাজেট শক্তিশালী ও বিকশিত ভারতের লক্ষ্যে এক দৃঢ় পদক্ষেপ।

যে প্রক্রিয়ার সূচনা হয়েছিল ১৯৯১ সালে মনমোহন সিংহের বাজেটের মাধ্যমে তা ১৯৯৫-১৯৯৮ সময়কালের অস্থিতিশীল রাজনীতির আবর্তে হারিয়ে যায়। ১৯৯৮ থেকে ২০০৪ সময়কালে একটি জোট সরকারের প্রধানমন্ত্রী হয়েও অটলবিহারী বাজপেয়ী আর্থিক সংস্কারের মাধ্যমে এক উন্নত ভারত গড়ার স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন। বাজপেয়ীর আমলের বাজেটগুলি কেবল করের হার হ্রাস-বৃদ্ধির খতিয়ানে পর্যবসিত হয়নি, আর্থিক সংস্কারের মাধ্যমে উন্নত অর্থব্যবস্থার পথে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছিল ভারতবর্ষ। ২০০৪-২০১৪ সময়কালে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন জোট সরকারের আমলে বাজেট নয়, মানুষ আলোচনা করতো এদেশে কতটা দুর্নীতি হয়েছে, দেশের সম্পদ কত পরিমাণ লুটপাট করা হয়েছে, তার জন্য কে কে জেলে গেছে বা যাবে তা নিয়ে। ১৯৯১ সালে প্রধানমন্ত্রী পিভি নরসিমহারায়ের অর্থমন্ত্রী হিসেবে যে দৃঢ়তা নিয়ে বাজেট পেশ করে এক নতুন অর্থনীতির সূচনা করার লক্ষ্যে বেশ কিছুটা সফল হয়েছিলেন ড. সিংহ। কারণ সরকারের চাবিকাঠি তাঁর হাতে ছিল না। সরকারের প্রধান ছিলেন তিনি, আর সরকার চালাতেন ইউপিএ-এর চেয়ারপার্সন। ক্ষমতার কাঠামো যদি এরকম হয় তার অর্থনীতি কেমন হবে তা সহজেই অনুমেয়।

২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদীর নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর দেশের মানুষ

কেবল জিনিসপত্রের দাম বাড়া-কমার খবর জানতে বাজেটের দিকে নজর রাখে না। রেডিয়ো ও টেলিভিশনের পর এখন সামাজিক গণমাধ্যমের যুগ শুরু হয়েছে। সারাবছর সরকারের অন্যান্য বিভিন্ন নীতির মতো অর্থনৈতিক নীতি ও সিদ্ধান্ত নিয়ে ব্যাপক কাটাছেঁড়া চলে বিভিন্ন গণমাধ্যমে। কোটি কোটি চোখ সর্বদা নজর রাখে সরকারের সমস্ত সিদ্ধান্তের ওপর। ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী পদে শপথ নেওয়ার পর নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদী কেন্দ্রীয় বাজেটকে এক উন্নত ভারত গড়ার মাধ্যমে পরিণত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সেই লক্ষ্য ২০১৬-এর বাজেটেও বজায় আছে। অর্থমন্ত্রী হিসেবে শ্রীমতী নির্মলা সীতারামন নবমবারের জন্য যে বাজেট পেশ করেছেন 'কর্তব্য ভবন' থেকে তাতে মোদী সরকারের 'ভিশন' অত্যন্ত স্পষ্ট। সেখানে কোনো দোদুল্যমানতা নেই, আছে দৃঢ় পদক্ষেপ; বাগাড়ম্বর নেই, আছে সংস্কারের পথে অগ্রগমন; 'পপুলিজম' নয় 'পিপল'কে গুরুত্ব প্রদান। সরকারের প্রধান লক্ষ্য এক আত্মনির্ভর ভারত গঠন, আর তার জন্য এই বাজেট কাঠামোগত সংস্কার, আর্থিক বিচক্ষণতা বা ফিসক্যাল প্রুডেন্স, জনস্বার্থে সরকারি অর্থব্যয় প্রভৃতির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে যাতে কৃষি ও শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, পরিকাঠামোর উন্নতি হয়, কর্মসংস্থান বাড়ে এবং মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এভাবেই বিকশিত ভারতের স্বপ্ন সফল হবে। এই নিবন্ধের স্বল্প পরিসরে বাজেটের সকল দিকের আলোচনা সম্ভব নয়। এই আলোচনার মূল লক্ষ্য হলো কীভাবে ২০২৬-২৭ সালের বাজেট এ দেশকে এক বিকশিত আত্মনির্ভর ভারত গড়ার লক্ষ্যে দেশকে চালিত করছে। মনে রাখতে হবে, বিশ্ব অর্থনীতি এখন যথেষ্ট সংকটের মধ্য দিয়ে চলছে। বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে ভূরাজনৈতিক উত্তেজনা ও সংকট সমানে চলেছে। আমেরিকার অর্থনৈতিক নীতি ও সিদ্ধান্ত বিশ্ব অর্থনীতিতে মাঝে মাঝেই স্থিতিশীলতার ওপর প্রশ্নচিহ্ন এঁকে দিচ্ছে। বিশ্বের বৃহৎ অর্থনীতিগুলো নানা সংকটের মুখোমুখি হচ্ছে। উদার অর্থনীতির মূল ভাবনাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বহু দেশ ইকনমিক প্রোটেকশনিজম বা অর্থনৈতিক সুরক্ষাবাদের আশ্রয় নিচ্ছে। বিশ্বায়নের যুগে এই সবকিছুই ভারতকে প্রভাবিত করছে। এই নিদারুণ সময়ের প্রেক্ষাপটে নির্মলা সীতারামনের পেশ করা বাজেট এক শক্তিশালী ও বিকশিত ভারতের লক্ষ্যে এক দৃঢ় পদক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

একটি শক্তিশালী আত্মনির্ভর দেশ গড়ে তুলতে গেলে কী করতে হবে? প্রথমত, দেশের মানুষের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ কাজ না থাকলে মানুষের হাতে অর্থ থাকে না। মানুষের হাতে ব্যয় করার মতো অর্থ না থাকলে বাজার কখনো বৃদ্ধি পাবে না। আর বাজার বৃদ্ধি না পেলে কখনোই দেশ এক উন্নত অর্থনীতির স্তরে পৌঁছাতে পারবে না। দ্বিতীয়ত, সর্বদা অস্থিতিশীল বিশ্বব্যবস্থায় দেশের সুরক্ষার বিষয়টির গুরুত্ব ও প্রাথমিকতা অনস্বীকার্য। তৃতীয় ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো উৎপাদন ও পরিকাঠামো ক্ষেত্রে আরও বেশি বিনিয়োগ যা দেশের অর্থনীতিকে পৌঁছে দেবে বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী অর্থনীতির স্তরে। ২০১৪ সালে নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদী যখন প্রধানমন্ত্রী হন ভারত তখন ছিল বিশ্বে ১২তম অর্থনীতি। আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের হিসেব অনুযায়ী ভারত এখন বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হয়েছে। ২০৪৭ সালে স্বাধীনতার ১০০তম বর্ষে ভারতকে বিশ্বের প্রথম দুটো অর্থনীতির একটিতে পরিণত করার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছে ভারত সরকার। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই তৈরি হয়েছে ২০২৬-২৭ সালের কেন্দ্রীয় বাজেট।

২০২৫ সালের হিসেব অনুযায়ী দেশের প্রায় ২৫ কোটি মানুষ কাজ করেন ৫.৯৩ কোটি নিবন্ধিত মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্প উদ্যোগগুলিতে যা এমএসএমই নামে পরিচিত। দীর্ঘদিন ধরে এই প্রতিষ্ঠানগুলি মূলধন ও উন্নত প্রযুক্তির অভাবে সমস্যায় ছিল। প্রধানমন্ত্রী মোদী ক্ষমতায় আসার পর এই এমএসই-গুলিকে গ্রোথ ইঞ্জিন হিসেবে গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেন। গত ২০২৫-২৬ সালের বাজেটে এই ক্ষেত্রটিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের বাজেটে ইক্যুইটি সাপোর্ট হিসেবে দশ হাজার কোটি টাকার এমএসএমই গ্রোথ ফান্ড তৈরি করা হয়েছে। আর ২০২১ সালে গড়ে তোলা সেলফ্ রিলায়েন্ট ইন্ডিয়া ফান্ডে ২০০০ কোটি টাকা দিয়ে এই ক্ষেত্রটিকে আরও উন্নত করার উদ্যোগ এই বাজেটে নেওয়া হয়েছে। কৃষিক্ষেত্রের জন্য নেওয়া হয়েছে কতগুলো বিশেষ ব্যবস্থা। প্রথাগত কৃষির পাশাপাশি নারকেল, কোকো, কাজু, বাদাম চাষের জন্য নেওয়া হয়েছে বিশেষ ব্যবস্থা। অপারেশন সিন্দুর পরবর্তীকালে দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে শক্ত করতে প্রতিরক্ষা ব্যয়বরাদ্দ বেড়েছে ১৫ শতাংশ। ২০২৫ সালের বাজেটে যেখানে ব্যয়বরাদ্দ ছিল ৬.৮১ লক্ষ কোটি টাকা বর্তমান বাজেটে তা হয়েছে ৭.৮৫ লক্ষ কোটি টাকা। তবে সবচেয়ে গুরুত্ব পেয়েছে কাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি বিকাশ। ২০১৪-১৫ সালে পাবলিক ক্যাপিটাল এক্সপেনডিচার ছিল ২ লক্ষ কোটি টাকা, ২০২৫-২৬ সালে তা হয় ১১.২ লক্ষ কোটি টাকা। বর্তমান বাজেটে তা হয়েছে ১২.২ লক্ষ কোটি টাকা। ডানকুনি থেকে সুরাট ডেডিকেটেড ফ্রেট করিডোর, ২০টি জাতীয় জলপথ এবং আরও একঝাঁক পরিকাঠামো উন্নয়নের পরিকল্পনা নিঃসন্দেহে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে উন্নয়নের পথে, নির্মাণ হবে এক শক্তিশালী ভারতের।

এই বাজেটে নেওয়া পদক্ষেপগুলির প্রতিটিকে নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা যায় যা এই স্বল্প পরিসরে সম্ভব নয়। এখানে এই বাজেটের একটি সাধারণ ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্র নিয়ে পরবর্তী সময়ে বিস্তারিত আলোচনা করা যাবে। □

বাংলাদেশে নির্বাচনকে সামনে রেখে উদ্বিগ্ন ও শঙ্কিত হিন্দু সমাজ

ঢাকা থেকে বিশেষ প্রতিনিধি ॥ আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু বিশেষ করে হিন্দু সমাজের মধ্যে বড়ো ধরনের শঙ্কা ও উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। অতীতে বাংলাদেশে সব জাতীয় সংসদ নির্বাচনে হিন্দুদের ওপর হামলা হয়েছে, বাড়িঘর ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অগ্নিসংযোগ, হত্যা ও নির্বিচারে ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল ২০০৮ সালে সেনা-সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন। আর সবচেয়ে বড়ো হামলার ঘটনা ঘটেছে ২০০১ সালে নির্বাচনের পর। এই নির্বাচনের পর জয়ী বিএনপি বিশেষ করে হিন্দুদের ওপর এই হামলা চালিয়েছিল। হিন্দুরা নির্বাচনে ভোট দিয়ে হামলার শিকার হয়েছে, ভোট না দিয়েও হামলার শিকার হয়েছে। জয়ী দলও হামলা করেছে, পরাজিত দলও হামলা করেছে।

এবারের নির্বাচনে পরিস্থিতি আরও বৈরী। গত ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট জেহাদি ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে আওয়ামি লিগ সরকারের পতনের পর হিন্দুদের ওপরই ভয়াবহ হামলা শুরু হয়, যা এখনো অব্যাহত রয়েছে। সরকারের উচ্চ পর্যায় থেকে হিন্দুদের সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা থেকে হয় চাকরিচ্যুত করা হয়েছে অথবা 'মব হামলা' করে অফিসে আসা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মহম্মদ ইউনুস অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারী জেহাদি ছাত্রদের দিয়ে এই হামলাগুলো সংগঠিত করেছেন। এরাই 'প্রথম আলো' ও 'ডেইলি স্টার'-এর মতো জনপ্রিয় বহুল প্রচারিত সংবাদপত্র এবং 'ছায়ানট' ও 'উদীচী'র মতো সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে হামলা ও অগ্নিসংযোগ করেছে। জেহাদি ছাত্রদের তিন প্রতিনিধি ইউনুসের উপদেষ্টা পরিষদে (মন্ত্রীসভা) ছিল, পরে ন্যাশনাল সিটিজেন পার্টি (এনসিপি) নামে রাজনৈতিক দল গঠন করে এবং জামায়াতে ইসলামি-সহ ১০টি ইসলামি জোটের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে। স্বাভাবিকভাবে হিন্দুরা শঙ্কিত এই ভেবে যে, নির্বাচন বা পরবর্তী সময়ে 'মবতন্ত্র' আরও ব্যাপক রূপ নিতে পারে, যার শিকার হবে মূলত হিন্দুরা।

আওয়ামি লিগ সরকারের পতনের পর সাম্প্রদায়িক হামলা কীভাবে বিস্তৃত হয়েছে তার মোটামুটি একটি চিত্র এখানে তুলে ধরা যেতে পারে। বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য জানিয়েছে, গত ২০২৪ সালের ৪ আগস্ট অর্থাৎ রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের একদিন আগে থেকে ওই বছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত সারা দেশে মোট ২১৮৪টি সাম্প্রদায়িক হামলা হয়েছিল। গত বছর ২০২৫ সালের প্রথম দিকে জাতিসঙ্ঘের তথ্যানুসন্ধান রিপোর্টেও তা প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়।

তবে শান্তিতে নোবেলজয়ী অধ্যাপক ড. মহম্মদ ইউনুস হিন্দুদের ওপর হামলার নতুন সংজ্ঞা দিয়েছেন। নতুন সংজ্ঞায় 'সাম্প্রদায়িকতা'কে সংজ্ঞায়িত করে বলেছেন, কেবলমাত্র মন্দির বা উপাসনালয়ে সংঘটিত সহিংসতা ছাড়া সংঘটিত অন্য কোনো ঘটনা সাম্প্রদায়িক সহিংসতা নয়।

গত বছরের বহুল আলোচিত হত্যাকাণ্ডের মধ্যে সাতক্ষীরার আশাশুনিতে অনিমেষ সরকারকে হত্যা করে গাছে ঝুলিয়ে রাখা, নাটোরের লালপুরে সুকুমার নামে এক ভ্যানচালককে গলাকেটে হত্যা, সাভারের আশুলিয়ায় স্ত্রীর সামনে স্বর্ণব্যবসায়ী দিলীপ দাসকে কুপিয়ে হত্যা, গোপালগঞ্জের কোটালিপাড়ায় পিয়াস মজুমদারকে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা, দিনাজপুরের বিরলে ভবেশচন্দ্র রায়কে পিটিয়ে হত্যা, নোয়াখালির সুবর্ণচরে সুব্রত দাসকে নির্মমভাবে কুপিয়ে হত্যা, দিনাজপুরের নবাবগঞ্জে জনজাতি যুবক শুভ সরেনকে নির্মমভাবে হত্যা, ময়মনসিংহের ভালুকায় ইসলাম অবমাননার মিথ্যা অভিযোগে দীপুচন্দ্র দাসকে পিটিয়ে আগুনে পুড়িয়ে নির্মমভাবে হত্যা ও ব্রজেন্দ্র বিশ্বাসকে গুলি করে হত্যা, ফরিদপুরের সালখায় মৎস্য ব্যবসায়ী উৎপল সরকারকে নির্মমভাবে হত্যা, নরসিংদীতে স্বর্ণ ব্যবসায়ী প্রান্ত সরকারকে গুলি করে হত্যা, রাজবাড়ির পাংশায় অমৃত মণ্ডলকে গণপিটুনি দিয়ে হত্যা, রংপুরের তারাগঞ্জে মুক্তিযোদ্ধা যোগেশ চন্দ্র রায় ও তার স্ত্রী সুবর্ণা রায়কে গলা কেটে হত্যা, চট্টগ্রামের রাউজানে হিন্দু ও বৌদ্ধদের ৫টি বাড়িতে বাইরে থেকে দরজা আটকিয়ে আগুন, পিরোজপুর সদরে ৫টি হিন্দু বাড়িতে আগুনের ঘটনাকে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার সাম্প্রদায়িক ঘটনা বলে মানতে নারাজ। ইতিমধ্যে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে এসব হত্যাকাণ্ডকে সাম্প্রদায়িক হত্যা বলে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং মানবাধিকার সংগঠনগুলো বিভিন্ন সময় এ ব্যাপারে বিবৃতিও প্রদান করেছে।

আন্তর্জাতিক হিন্দু সংস্থা ইসকনকে 'সন্ত্রাসী' ট্যাগ লাগিয়ে চট্টগ্রামের হাটহাজারীর পুণ্ডরীক ধামের অধ্যক্ষ প্রভু চিন্ময়কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারীকে রাষ্ট্রদ্রোহ ও হত্যা-সহ একাধিক মামলার মিথ্যা অভিযোগে কারারুদ্ধ করা হয়েছে এবং তার মধ্যে কয়েকটির প্রহসনমূলক বিচার ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। ইসকনকে নিষিদ্ধ করার জন্য কোনো কোনো মহল থেকে দাবি তোলা হয়েছে। একাধিক

মিথ্যা ও হয়রানিমূলক মামলায় অভিযুক্ত করে স্বাভাবিক জীবনযাপন থেকে দূরে থাকতে বাধ্য করা হয়েছে ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এবং সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার আন্দোলনের নেতা বিশিষ্ট আইনজীবী অ্যাডভোকেট রাণা দাশগুপ্ত-সহ ঐক্য পরিষদের একাধিক নেতাকে।

এখনো গত বছরের মতো চলমান সাম্প্রদায়িক সহিংসতা অব্যাহত রয়েছে। বর্তমান সময়ে হিন্দুদের জনমনে উল্লেখিত কারণে প্রচণ্ড ভয়ের পরিস্থিতি বিরাজ করছে এবং 'মব' সহিংসতা চলছে। এরই মধ্যে আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। ঐক্য পরিষদ বলেছে, সারা দেশে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু, জনজাতি জনগোষ্ঠী বিশেষ করে নারী, যুবক-যুবতীরা প্রতিনিয়ত ভয় ও আতঙ্কের মধ্যে দিনাতিপাত করছেন। সংখ্যালঘু ব্যবসায়ীরা নিজ অবস্থানে থেকে স্বাভাবিকভাবে তাদের ব্যবসা পরিচালনা করতে পারছেন না। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের হিন্দুরা বিশেষ করে ছাত্র-ছাত্রী, যুবক-যুবতী ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে একটি বিশেষ অংশ নিরাপত্তার জন্যে দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন স্থানে আত্মগোপন করে জীবন বাঁচাতে বাধ্য হচ্ছেন।

সংবাদ সম্মেলনে আরও বলা হয়েছে, জাতি-ধর্ম-গোত্র-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচন হওয়ার ক্ষেত্রে এখনো অনেক চ্যালেঞ্জ রয়েছে। কারণ জেহাদি গোষ্ঠীর বিদ্বেষমূলক বক্তব্য, ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের প্রতি ঘৃণা ও সহিংসতার শুধু সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করেছে না, এ ধরনের উসকানিমূলক বক্তব্য ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উপর হামলার ক্ষেত্র প্রস্তুত করছে। এর ফলে আপামর ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু ও জনজাতি জনগোষ্ঠী শুধু ক্ষুব্ধ নয়, স্বদেশে তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে নিতান্তই শঙ্কিত ও উদ্বিগ্ন। এহেন পরিস্থিতিতে সরকার, প্রশাসন, নির্বাচন কমিশন, রাজনৈতিক দল-কেউ তাদের মনে কোনোরূপ আশা ও আস্থা জাগাতে পারছে না। এর দায় নিতে হবে আগামী নির্বাচনে কমিশন ও রাজনৈতিক দলগুলোকে।

ঐক্য পরিষদ আরও বলেছে, এবারকার জাতীয় সংসদ নির্বাচনে গণভোটের নামে যুক্ত হয়েছে 'হ্যাঁ' ও 'না' ভোট। যেখানে ধর্মনিরপেক্ষতাকে বাদ দিয়ে সরকার পরিচালনার মূলনীতি ঘোষণা করা হয়েছে। যার পক্ষে সরকার ও নির্বাচন কমিশন সরাসরি প্রচার চালাচ্ছে, যা দুঃখ ও দুর্ভাগ্যজনক এবং নিতান্তই পক্ষপাতদুষ্ট বলেই আমরা মনে করি। আমরা আরও মনে করি, মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে তৎকালীন সময়ে সাড়ে সাত কোটি মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং ত্রিশ লক্ষ বলিদানীর স্বপ্নের উপর ভিত্তি করে অসাম্প্রদায়িক, ধর্মনিরপেক্ষ, বৈষম্যহীন বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে সমঅধিকার পাবার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। এই পরিস্থিতিতে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর নিরাপদে ভোটকেন্দ্রে যাওয়া এবং তার নিজ পছন্দ অনুযায়ী ভোট প্রদান একটি বড়ো চ্যালেঞ্জ।

ঐক্য পরিষদ ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু ভোটাররা যাতে নির্বিঘ্নে ভোটকেন্দ্রে যেতে পারেন, প্রার্থী হওয়ার কারণে কোনোরকম বাধার সম্মুখিন না হতে হয় এবং নির্বাচনী প্রচারণায় অংশগ্রহণে সমান সুযোগ পায় তার জন্য নির্বাচন কমিশনকে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরি করে ইতিবাচক পরিবেশ সৃষ্টি, নির্বাচনী প্রচারে ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতার ব্যবহার নিষিদ্ধ, যদি কোনো প্রার্থী বা কোনো দল নির্বাচনে ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতাকে ব্যবহার করে তবে তার কঠোর শাস্তি, সেনাবাহিনী নিয়োগের মাধ্যমে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা, সকল ধর্মীয় উপাসনালয় যথা— মসজিদ, মন্দির, প্যাগোডা, গির্জা নির্বাচনী প্রচার কাজে ব্যবহার নিষিদ্ধ করা, ধর্মীয় বিদ্বেষমূলক বক্তব্য, বিবৃতি, মিথ্যা গুজব প্রচার অপরাধ হিসেবে গণ্য করে শাস্তিমূলক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করার দাবি জানিয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রোবায়েত ফেরদৌসের নেতৃত্বে একটি বুদ্ধিজীবী প্রতিনিধিদল গত ১ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রামের রাউজান উপজেলার হিন্দু অধ্যুষিত সুলতানপুর গ্রামে গিয়েছিলেন। এই গ্রামে হিন্দুরা কয়েক মাস ধরে হামলার শিকার হচ্ছেন। কয়েকটি হিন্দু বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে। ভয়ার্ত হিন্দুরা প্রতিনিধিদলকে জানিয়েছেন, তাঁরা ভোট দিতে চান না। ভোট কেন্দ্রে যেতে চান না। অধ্যাপক ফেরদৌস পরে সাংবাদিকদের বলেছেন, হিন্দুদের ওপর হামলা হচ্ছে এমন কয়েকটি জেলায় তাঁরা পরিদর্শনে গিয়ে এমন উদ্বেগ লক্ষ্য করছেন। সংখ্যালঘুদের মধ্যে আতঙ্ক তৈরির চেষ্টা চলছে।

আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম আল জারিয়া নির্বাচনকে সামনে রেখে বাংলাদেশে হিন্দুদের অবস্থা নিয়ে সম্প্রতি কয়েক দফা প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের ইতিহাসে নির্বাচনের সময়গুলোতে দেশজুড়ে সাম্প্রদায়িক ও রাজনৈতিক সহিংসতা বেড়ে যাওয়ার নজির রয়েছে। প্রায়ই তীব্র রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সামাজিক উত্তেজনাপূর্ণ এই সময়টার ভুক্তভোগী হন ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৪ সালের আগস্টে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বিতাড়নের পর থেকে বাংলাদেশে হিন্দুরা নিজেদের অবরুদ্ধ মনে করছেন। তাঁদের ওপর হামলা, হত্যাকাণ্ড এবং বাড়িঘর ও দোকানপাটে অগ্নিসংযোগের খবর পাওয়া গেছে। যদিও সরকারের পক্ষ থেকে জোর দিয়ে বলা হচ্ছে, এসব ঘটনার বেশিরভাগই ধর্মীয় বিদ্বেষপ্রসূত নয়। এমন এক পরিস্থিতিতে ১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচন ঘিরে উদ্বেগ আরও ঘনীভূত হয়েছে, যদিও বড়ো রাজনৈতিক দলগুলো হিন্দুদের আস্থা অর্জনের চেষ্টা করছে।

নির্বাচনের আগে অনেক উদ্বেকজনক খবর এসেছে। এক খবরে বলা হয়েছে, ১৪ বছর পর সরাসরি ফ্লাইট চালু হওয়ার পর গত ৩০ জানুয়ারি পাকিস্তান থেকে আসা বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের এর ফ্লাইট বিজি ৩৪২-এ সাধারণ যাত্রীর ছদ্মবেশে ঢাকায় এসেছে পাকিস্তানের জঙ্গি সংগঠন সস্কর-ই-তৈইবার সদস্যরা। কোনো অজ্ঞাত কারণে বিমানবন্দরে তাদের নিরাপত্তা তল্লাশি হয়নি। ২০২৪ সালের জুলাই আন্দোলনে লস্কর-ই-তৈয়বার সরাসরি সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ ছিল। খবরে আরও বলা হয়েছে, পাকিস্তানি নাগরিকদের ভিসা শিথিল করা হয়েছে। □

ভারতীয় রাষ্ট্রীয়তার পথপ্রদর্শক ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

রানার চট্টরাজ

ঊনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গের ইতিহাসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো রাষ্ট্রীয়তার উদ্ভব। ১৮৮২ সালে প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ চরমপন্থী আন্দোলনের ঋত্বিক ঋষি অরবিন্দ এবং তাঁর সমসাময়িক রাজনৈতিক ব্যক্তিদের বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। পরবর্তীকালে মাতৃভূমির শৃঙ্খলমুক্ত করার জন্য নিঃস্বার্থ, নির্ভীক আন্দোলনের প্রেরণা ছিল আনন্দমঠ। বঙ্কিমচন্দ্রের গীতার অনুবাদ এবং তার বিশ্লেষণ তৎকালীন যুব সমাজের উপর বিশেষ প্রভাব ফেলেছিল।

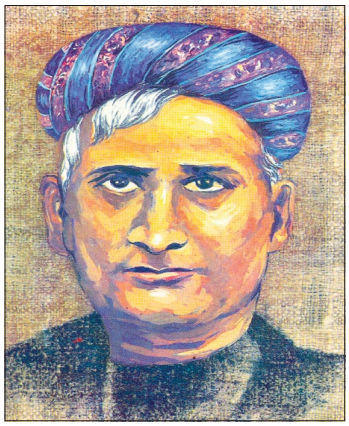

বঙ্কিমের রাষ্ট্রীয়তার মূল সুর ছিল জাতীয় বা রাষ্ট্রীয় ঐক্য, কারণ তার উপর নির্ভর করেছিল তাঁর হিন্দু সমাজ গড়ার স্বপ্ন। এই কারণে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রকে সাম্প্রদায়িক আখ্যা দেওয়া ঠিক নয়। তাঁর উপন্যাসে অনেক গুরুত্বপূর্ণ মুসলমান চরিত্রের উপস্থিতি ছিল। এছাড়া বঙ্কিমের জীবিতাবস্থায় রাজনৈতিক সমাজ ও ঐক্যবদ্ধ প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ভারতবাসীর কোনো ধারণা ছিল না। ভারতবর্ষ জাতপাত, বহুবিধ ভাষা এবং আঞ্চলিক সংস্কৃতির দ্বারা শত বিভক্ত এক ভূখণ্ড ছিল মাত্র। এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে, বঙ্কিমচন্দ্র যেহেতু উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ছিলেন, তাঁর পক্ষে প্রত্যক্ষভাবে ব্রিটিশ সরকার বিরোধী মনোভাব গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। জাতীয় বা রাষ্ট্রীয় ঐক্য স্থাপনের জন্য বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুত্বের কিছু বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করেছিলেন। একই সঙ্গে তিনি বিভিন্ন ক্ষেত্রে হিন্দু সমাজের নানাবিধ কুপ্রথার তীব্র সমালোচক ছিলেন। তাঁর রাষ্ট্রীয়তার মন্ত্র ছিল 'স্বকীয়তা, ঐক্য ও শক্তি' (identity, unity and strength)। দেশের মানুষের ঐক্য সুনিশ্চিত করার জন্য তিনি 'কর্মযোগ'-এর উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। ১৮৮২ সালে General Assembly-র Reverend Hastie হিন্দুত্ব ও হিন্দু সমাজের তীব্র নিন্দা করে একটি নিম্নরুচির প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন। ক্রোধান্বিত বঙ্কিমচন্দ্র এর বিরুদ্ধে Hastie-এর যুক্তি খণ্ডন করে একটি দীর্ঘ, সুচিন্তিত ও যুক্তিপূর্ণ উত্তর প্রকাশ করেন।

সম্ভবত ১৮৭০-এর মাঝামাঝি সময় থেকে বঙ্গের পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিবেশের দ্বারা বঙ্কিমচন্দ্র প্রভাবিত হয়েছিলেন। ১৮৫৭ সালে মহাবিদ্রোহ অর্থাৎ প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় বঙ্গের মধ্যবিত্ত সমাজ সাধারণভাবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি অর্থাৎ ইংরেজদের প্রতি অনুগত ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে ব্রিটিশ সরকারের দমনমূলক নীতি এবং কয়েকটি উদারতা বিরোধী আইন প্রণয়নের ফলে বাঙ্গালি মধ্যবিত্ত সমাজ হতাশ ও বিরক্ত হয়। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী একাধিক প্রতিষ্ঠান তৈরি হয়। বঙ্গের এই পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতির দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার ফলে বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে প্রথমের দিকে যে জাতপাত প্রথা, লিঙ্গভেদ, শ্রেণীবৈষম্য— এই সমস্ত মানসিকতা ছিল, তা ক্রমে অন্তর্হিত হয়।

এখন তাঁর ভাবনা ও অনুসন্ধানের বিষয় হলো 'প্রকৃত হিন্দুত্ব কী, অতীতে হিন্দুত্বের মধ্যে কী সম্ভাবনা ও ইতিবাচক দিক ছিল এবং অতীতের ভালো জিনিসগুলিকে কীভাবে ভবিষ্যতে জাতীয় বা রাষ্ট্রীয় ঐক্যের জন্য সদ্ব্যবহার করা যায়। তাঁর উদ্দেশ্য হলো, ভারতীয়দের এক জাতিতে পরিণত করা, অবশ্যই শ্রীকৃষ্ণের আদর্শে, হিন্দুত্বের ছাতার তলায়। বঙ্কিমের মতে, ঈশ্বর ও মানবতা অভিন্ন। ব্যক্তির ধর্ম হলো (পাশ্চাত্যের রিলিজিয়ন নয়) তাঁর দৈহিক ও বৌদ্ধিক গুণাবলীর ভারসাম্য বিকাশ এবং নিঃস্বার্থভাবে কর্তব্য পালন। বঙ্কিমচন্দ্র একে বলেছেন অনুশীলন, যার অর্থ ঈশ্বরের প্রতি নিঃস্বার্থ আত্মসমর্পণ এবং ভালোবাসার সম্প্রসারণ— প্রথমে নিজের প্রতি, তারপর পরিবারের প্রতি, সমাজের প্রতি, দেশের প্রতি এবং চূড়ান্তভাবে সমগ্র বিশ্ব মানবতার প্রতি। তিনি অবশ্য স্বীকার করেছিলেন, কাজটা বড়ো কঠিন। বঙ্কিম ভারতবাসীর কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন, দেশের প্রতি, মাতৃভূমির প্রতি, নিঃস্বার্থ ভালোবাসাই হলো ধর্মের শ্রেষ্ঠ রূপ।

অতএব বলা যেতে পারে, ভারতের জাতীয়তাবোধ বা রাষ্ট্রীয়তাবোধের বৌদ্ধিক ভিত্তি ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র স্থাপন করেছিলেন। এক শ্রেণীর সমালোচক বঙ্কিমকে সামাজিক প্রতিক্রিয়াশীল, উদার সংস্কার বিরোধী এবং সামাজিক প্রগতি বিরোধী গোঁড়া সম্প্রদায়ের মুখপাত্র হিসেবে বর্ণনা করেন। কিন্তু প্রখ্যাত ঐতিহাসিক অধ্যাপক অমলেশ ত্রিপাঠীর মতো গবেষকদের মতে এই ধরনের সমালোচনা অজ্ঞতার প্রতিফলন অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে তথ্যের বিকৃত করা হয়েছে। আগেই বলা হয়েছে, বঙ্কিম সামাজিক কুপ্রথাকে অন্ধভাবে মেনে নেননি এবং বলেছেন রিলিজিয়নের বিকল্প দেশাত্মবোধ নয়। তিনি সংকীর্ণ জাতীয়তাবোধকে কখনো মেনে নেননি। মুসলমানদের বিরুদ্ধে নয়, উভয় ধর্মমতের অত্যাচারী ও স্বৈরাচারী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে তিনি কলম ধরেছিলেন। ভারতীয় রাষ্ট্রীয়তার অন্যতম পুরোধাপুরুষ ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। □

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ও গণতন্ত্রের সংকট

অরুণ কুমার চক্রবর্তী

গণতন্ত্রের মূল স্তম্ভগুলির একটি হলো আইনের শাসন— যেখানে শাসক ও শাসিত সকলেই আইনের কাছে সমান। কিন্তু যখন ক্ষমতার শীর্ষে থাকা কেউ যদি আইনের সীমারেখা অতিক্রম করার অভিযোগে অভিযুক্ত হন, তখন তা শুধু ব্যক্তিগত বিতর্কে সীমাবদ্ধ থাকে না; তা প্রশাসনিক ব্যবস্থায় নৈতিক ভিতকে নাড়িয়ে দেয়। সাম্প্রতিক সময়ে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়েকে ঘিরে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট সংক্রান্ত একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে বিতর্ক তৈরি হয়েছে, তা সেই আশঙ্কাকেই নতুন করে উসকে দিয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রীর পদ ও সাংবিধানিক দায়িত্ব :

১. মুখ্যমন্ত্রী কেবল একটি রাজনৈতিক দলের নেতা নন; তিনি রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান নির্বাহী। তাঁরা প্রতিটি কাজ সরকারের প্রতিনিধিত্ব করে। সেই কারণে— তদন্তকারী সংস্থার কাজে হস্তক্ষেপের অভিযোগ। প্রশাসনিক সীমা অতিক্রম করে বলপ্রয়োগের অভিযোগ। কেন্দ্রীয় সংস্থার নথি সংক্রান্ত বিতর্ক— এসব যদি কোনো মুখ্যমন্ত্রীর নামের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে, তবে তা ব্যক্তিগত নয়, প্রাতিষ্ঠানিক সংকট তৈরি করে।

২. **'গায়ের জোরে' রাজনীতি :** প্রতিবাদের ভাষা না ক্ষমতার প্রদর্শন? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দীর্ঘদিন ধরেই নিজেকে 'রাস্তার আন্দোলন নেত্রী' হিসেবে তুলে ধরেছেন। বিরোধী রাজনীতিতে এই ভঙ্গি অনেক সময় জনপ্রিয়তা এনে দিলেও, ক্ষমতায় থাকার পর সেই একই আচরণ অরাজকতার প্রতীক হয়ে ওঠে। যদি সত্যিই কোনো তদন্তকারী সংস্থার দপ্তরে ঢুকে পড়া, চাপ সৃষ্টি করা বা নথি ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠে থাকে, তবে প্রশ্ন উঠবে— মুখ্যমন্ত্রীর কি আইনি পথ নেওয়ার সুযোগ ছিল না? আদালত ও আইনজীবীর মাধ্যমে প্রতিবাদ জানানো যেত না? কেন একজন সাংবিধানিক পদাধিকারীকে নিম্নস্তরের রাজনীতি করতে হলো?

৩. **তদন্তকারী সংস্থার স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র :** গণতন্ত্রে তদন্তকারী সংস্থার স্বাধীনতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইডি, সিবিআই বা অন্য যেকোনো সংস্থার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক অপব্যবহারের অভিযোগ থাকতে পারে— সে বিতর্ক আলাদা। কিন্তু তার মোকাবিলা করতে হবে আইনি প্রক্রিয়ায়, নথিভিত্তিক যুক্তিতে, আদালতের নজরদারিতে। শারীরিক উপস্থিতি, জনবল প্রদর্শন বা চাপের অভিযোগ যদি ওঠে, তবে তা তদন্ত ব্যবস্থাকে দুর্বল করে এবং ভবিষ্যতে যেকোনো শাসককে একই পথ নেওয়ার নৈতিক লাইসেন্স দেয়।

৪. **'আমি লড়াই করি' বনাম 'আমি শাসন করি' :** বিরোধী নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য ছিল— 'আমি লড়াই করি, মাথা নত করি না।' কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তাঁর বক্তব্য হওয়া উচিত— 'আমি আইন মেনে শাসন করি।' এই দুই সত্তার পার্থক্য না বুঝলে শাসনব্যবস্থা ব্যক্তিনির্ভর হয়ে পড়ে। তখন প্রতিষ্ঠান নয়, ব্যক্তি বড়ো হয়; আইন নয়, আবেগ চালিকাশক্তি হয়; যুক্তি নয়, ভয় ও আনুগত্য রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করে।

৫. **নথি চুরি বিতর্ক :** প্রশ্নের কেন্দ্রে নৈতিকতা নথি 'চুরি' হয়েছে কিনা— সে বিষয়ে চূড়ান্ত সত্য নির্ধারণ করবে তদন্ত ও আদালত। কিন্তু রাজনৈতিকভাবে যে প্রশ্নগুলো উঠছে, সেগুলো এড়ানো যায় না। কেন মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতেই এমন অভিযোগ উঠল? কেন প্রশাসন ও পুলিশের ভূমিকা নিয়ে সন্দেহ তৈরি হলো? কেন বারবার রাজ্য সরকারকে আত্মপক্ষ সমর্থনের বদলে আক্রমণাত্মক হতে দেখা যায়? নির্দোষ হলে সবচেয়ে শক্তিশালী উত্তর আসে স্বচ্ছতা থেকে, হুমকি বা শক্তি প্রদর্শন থেকে নয়।

৬. **রাজনৈতিক সংস্কৃতির অবক্ষয় :** এই ঘটনা গত কয়েক বছরে পশ্চিমবঙ্গে আমরা দেখেছি— বিরোধীদের গ্রেপ্তার ও হেনস্থা, কেন্দ্রীয় সংস্থার বিরুদ্ধে সংঘাতমূলক ভাষা, রাজনীতি ও প্রশাসনের অস্বাস্থ্যকর মেলবন্ধন। এই প্রেক্ষাপটে ইডি বিতর্ক একটি বৃহত্তর ছবির অংশ, যেখানে ক্ষমতা নিজেকে প্রশ্নের ঊর্ধ্বে রাখতে চায়।

৭. **'বঙ্গের সম্মান' না ব্যক্তির অহং?** মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রায়ই বলেন, 'বঙ্গের সম্মান রক্ষা করতে হবে।' কিন্তু প্রকৃত প্রশ্ন হলো— বঙ্গের সম্মান কি একজন ব্যক্তির আচরণের সঙ্গে একাকার? নাকি সম্মান আসে— শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান থেকে, স্বচ্ছ প্রশাসন থেকে, আইনের প্রতি শ্রদ্ধা থেকে? যে আচরণ গোটা দেশের সামনে রাজ্যকে বিতর্কে জড়ায়, তা পশ্চিমবঙ্গের গৌরব নয়— বরং কলঙ্কের অধ্যায় হয়ে ওঠে।

৮. **ভয়ের রাজনীতি ও নীরবতা :** এই ধরনের ঘটনার পরে দেখা যায় প্রশাসনের নীরবতা, পুলিশের অতিসক্রিয় আনুগত্য, বুদ্ধিজীবীদের একাংশের অস্বস্তিকর চুপ থাকা, এটাই সবচেয়ে বিপজ্জনক। কারণ গণতন্ত্রের হত্যা হয় শুধু অত্যাচারে নয়, নীরব থাকাতে।

৯. **ইতিহাস কী মনে রাখবে?** ক্ষমতাবানরা প্রায়ই ভাবেন ইতিহাস তাঁদের পক্ষে লেখা হবে। কিন্তু ইতিহাস মনে রাখে— কে আইন ভেঙেছিল, কে প্রতিষ্ঠান দুর্বল করেছিল, কে ব্যক্তিগত রাগকে দেশের উপর চাপিয়ে দিয়েছিল। আজ যে ঘটনাকে 'রাজনৈতিক লড়াই' বলে চালানো হচ্ছে, কাল তা পাঠ্যপুস্তকে ক্ষমতার অপব্যবহার হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে।

তিনি নিঃসন্দেহে এক সময়ের সংগ্রামী নেত্রী, কিন্তু ইতিহাস কাউকে অতীতের জন্য নয়, বর্তমানের কাজের জন্য বিচার করে। যদি সত্যিই তদন্তকারী সংস্থার কাজে হস্তক্ষেপ, বলপ্রয়োগ বা নথি সংক্রান্ত বিশৃঙ্খলার অভিযোগ প্রমাণিত হয়— তবে তা শুধু একটি ঘটনা নয়, তা হবে গণতন্ত্রের বুকে এক গভীর ক্ষত।

আইনের শাসনে বিশ্বাসী যেকোনো নাগরিকের দায়িত্ব হলো প্রশ্ন করা, সমালোচনা করা এবং মনে করিয়ে দেওয়া— 'কেউই আইনের ঊর্ধ্বে নয়'। □

আনন্দপুর অগ্নিকাণ্ডের দায় রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধানকে নিতেই হবে

জাহ্নবী রায়

বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে আনন্দপুর অগ্নিকাণ্ড নিয়ে নানা তথ্য। পুরসভার তরফে একটি সমীক্ষা চালানো হয়েছিল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় মারফত। শহরের পুকুর ভরাট নিয়ে এই সমীক্ষায় উঠে এসেছে নানা চাঞ্চল্যকর তথ্য। এই জলাভূমির অবস্থা যে ভয়ঙ্কর সেই কথাও বলা হয়েছে সেই রিপোর্টে। এমনকী এই জলাভূমির প্রায় ৫২ থেকে ৫৫ শতাংশ যে ভরাট হয়ে গেছে, সেটিও বলা হয়েছে সমীক্ষা রিপোর্টে। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের তদন্তে আরও ধরা পড়েছে নানা তথ্য। এই তথ্যে আবাক করার মতো বিষয় হলো রাজ্য প্রশাসনের পক্ষে বহুবার এই সরকারের শাসনকালে, সরকারি পক্ষে বহুবার এফআইআর হয়েছে (সংবাদমাধ্যমের রিপোর্ট অনুযায়ী ১৪ বছরে ৩৫৯টি)। কিন্তু কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি এই ক্ষেত্রে। আরও অবাক করা ব্যাপার, জাতীয় পরিবেশ আদালত রাজ্যের প্রশাসনকে সতর্ক করলেও কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি সরকারি তরফে। এদিকে আরও একটি বিষয় সবাইকে ভাবিয়ে তুলেছে এই জলাভূমি, যেখানে বেআইনি নির্মাণের অভিযোগ বারে বারে উঠেছে, সেটি ২০২৬-এর মধ্যে ভরাট ও জবরদখল মুক্ত করার জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। আর সরকারি তরফে আগামী চার বছরে এই দখল মুক্ত করা হবে বলে অ্যাকশন প্ল্যান তৈরি হয়েছে বলে জানা গেছে। তাহলে এই অগ্নিকাণ্ড কি কোনো পরিকল্পিত অন্তর্ঘাত? প্রশ্ন করেছে স্থানীয় মানুষ এবং ওই দুর্ঘটনায় চিরতরে হারিয়ে যাওয়া মানুষদের আত্মীয়স্বজন। এই কথাগুলি জানার পর কেউ কেউ বলছেন, এতগুলি প্রাণের মূল্যে কি সেই অ্যাকশন প্ল্যানের সূচনা হলো?

অন্যদিকে নানা প্রশ্ন তুলেছেন পরিবেশবিদরা। তাঁদের মতে পূর্ব কলকাতার একেবারে দ্বারপ্রান্তে এই ঐতিহ্যশালী জলাশয়। যা কিনা রামসার জলাভূমি নামেই বেশি পরিচিত সেই রক্ষাকবচকে ধ্বংস করে বেআইনি নির্মাণ হয়েছে। সেগুলি কি প্রশাসনের নজরে একেবারেই ছিল না? এখন দমকল মন্ত্রী ভূমি-রাজস্ব দপ্তরের ওপর দায় চাপিয়ে এড়িয়ে যাচ্ছেন পুরো বিষয়টি। এখানে আগুন ও অতগুলো প্রাণের চলে যাওয়া একটা অতি দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। সেখানে সরকার কি নিজের দায় এড়াতে পারে? রাজনৈতিক চাপান উতোরে কী আড়াল করতে চাইছে প্রশাসন?

তারা বলেছেন, এই গুদামগুলিতে নাকি অগ্নি নির্বাপণ ব্যবস্থা ছিল না। এর আগে বহু অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাস্থলে গিয়ে একই কথা বলেছেন দমকল মন্ত্রী। তাহলে কি ফায়ার অডিট হয় না? আবার এই সব দাহ্য পদার্থ ভর্তি গুদামগুলিতে দমকলের কোনো ছাড় পত্র ছিল কি? না থাকলে, কেন ছিল না? কেন ছিল না নজরদারি? এখানেও কি কাট মানি বা নজরানার বা মাসোহারার ব্যবস্থা ছিল?

পরিবেশবিদরা প্রশাসনিক নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলে বলছেন, এতগুলো এফআইআর, তবুও কেন নিশ্চুপ প্রশাসন? কেন কোনো সঠিক পদক্ষেপ নিল না সরকার?

পরিবেশবিদদের দাবি, রামসার কনভেনশন অনুসারে এই এলাকা আন্তর্জাতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ জলাভূমি হিসেবে ঘোষিত, তা সত্ত্বেও কেন তাঁর রক্ষা করার দায়িত্ব থেকে সরকার চোখ সরিয়ে রাখল? এখানেই মারাত্মক একটি সন্দেহের বিষয় উঁকি মারছে সবার মনে। এখানেও কি সেই জমি হাঙ্গরদের হানায় সব কিছুই বেআইনিভাবে হয়ে চলেছে? যেভাবে হারিয়ে গেছে শহর কলকাতা ও তাঁর আশে পাশের জলাভূমি। স্থানীয় মানুষেরা একটি অন্য অভিযোগ করেছেন, তাঁরা বলছেন, এখানে বহু জমি এমন হয়েছে যে, বার বার হাত বদল হওয়ার ফলে জমির চরিত্র বদলে গেছে অনেক ক্ষেত্রেই। ফলে জলাভূমি ভরাটের যে মারাত্মক একটি দুর্নীতি চক্র চলছে, সেটিও এই কেলেঙ্কারির সঙ্গে যুক্ত। একটু খোঁজ নিলেই দেখা যাবে কলকাতা পুরসভা এলাকায় এভাবেই চলছে জলাজমি ভরাট। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক, কলকাতা পুরসভার ১২৮ নম্বর ওয়ার্ডের তথাকথিত কালীঘাটের কাকুর এলাকায় অবাধে হয়েছে জলাভূমি ভরাট। এমনকী ফকিরপাড়া রোডের একটি রাস্তার ধারের পুকুর ভরাট করে ফ্ল্যাট উঠছে। স্থানীয় মানুষ বলছেন, ওখানের ওই পুকুরে তাঁরা স্নান করতেন। বিয়ের সময়ে জল সইতে আসতেন। ওই এলাকায় বহু জলাজমি এভাবেই এই সরকারের আমলে ভরাট হয়েছে। গোটা বেহালা এলাকায় ভুরি ভুরি এমন উদাহরণ আছে। যেখানে সিন্ডিকেটের মস্তানদের ভয়ে কেউ মুখ খুলতে সাহস পায় না।

বাম আমলে জলাভূমি বা পুকুর ভরাটের যে প্রথা চালু হয়েছিল, সেই ট্র্যাডিশন হাজার হাজার গুণ বৃদ্ধি পেয়ে, সিন্ডিকেটের বাহুবলে, জমি হাঙ্গরদের দখলদারিতে নষ্ট হয়েছে পরিবেশ। কলকাতা ও তাঁর আশপাশে হারিয়ে গেছে কয়েকশো জলাশয় ও পুকুর।

এখানে নাজিরাবাদের ওই জলাভূমি ভরাট ও জবরদখল মুক্ত করার ক্ষেত্রে কি এমন কোনো নাশকতার ছক বাস্তবায়িত করা হলো কি? প্রশ্ন উঠেছে সাধারণের মনে। সেটার তদন্ত হোক। চাইছেন সবাই। রাজনৈতিক চাপান-উতোর নয় অনেকগুলি তাজা প্রাণের বলি দেওয়া হলো সরকারি নিষ্ক্রিয়তায়, তাঁর দায় কে নেবে? সেই দায় কি সরকারের নয়? সেই দায় এড়িয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, পুরমন্ত্রী, দমকলমন্ত্রী, ভূমি-রাজস্ব মন্ত্রী কি এড়াতে পারেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মানবিকতা বিসর্জন দিয়ে সব মৃত্যুর পিছনে রাজনীতি খোঁজেন। এত বাঙ্গালি শ্রমিকের আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে মৃত্যু কী তাঁকে ভাবায় না? এটি যদি অন্য রাজ্যে হতো, তাহলে এতক্ষণ চিলচিৎকারে ফাটিয়ে দিতেন রাস্তাঘাট, সভামঞ্চ। তাহলে এক্ষেত্রে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নিশ্চুপ নীতি অবলম্বন করছেন কেন? অন্য জায়গায় মৃত্যু কিনতে দৌড়ান, এখানে সেই দৌড় নেই কেন? তাহলে কি এই নিশ্চুপ থাকার পিছনে অন্য কোনো রহস্য লুকিয়ে আছে? □

অজিত পাওয়ারের বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যু নিয়ে তৃণমূল নেত্রীর অবিবেচক মন্তব্য কি বিনাশকালে বুদ্ধিনাশ?

বিশ্বপ্রিয় দাস

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এখন কি দিশেহারা অবস্থায়? সবাইতো সেরকমই বলছে। কেননা তিনি নিজেই জানেন না কখন কী করছেন! কখন কী বলছেন? রাজনীতির 'র'-ও তিনি জানেন না বা বোঝেন না, সেটা তিনি বারে বারেই প্রমাণ করে দিচ্ছেন। এটা কি তাহলে বিনাশকালে বুদ্ধিনাশ অবস্থা? অনেকে বলছেন, হয়তো তাই, নইলে তিনি শুধু রাজনীতি করার কারণে একটি দুর্ঘটনাকে রাজনৈতিক অন্তর্ঘাতের রূপ দেবার চেষ্টা করছেন কেন?

গত ২৮ জানুয়ারি বিমান দুর্ঘটনায় মহারাষ্ট্রের উপ-মুখ্যমন্ত্রীর মৃত্যু নিয়ে তিনি যা বলেছেন, সেটি কি বাঞ্ছনীয়? এটা বিচারের দায়িত্ব কিন্তু জনগণ নেবেন। তিনি বিমান দুর্ঘটনাকে নিয়ে একটি কথার অবতারণা করেছেন। তিনি বলেছেন যে প্রয়াত অজিত পাওয়ার নাকি বিজেপির সঙ্গ ছাড়তে চেয়েছিলেন, ফিরে যেতে চেয়েছিলেন তাঁর পুরনো অবস্থানে। এই কারণে, তাঁকে হয়তো এই বিমান দুর্ঘটনার মাধ্যমেই সরিয়ে দেওয়া হলো। কী অবিবেচকের মতো দায়িত্বজ্ঞানহীন একটি কথা তিনি বললেন! অবশ্য অনেকেই তাঁর সব কিছু, বিশেষ করে শিক্ষা, জ্ঞানের পরিধি নিয়ে কটাক্ষ করে থাকেন। এক্ষেত্রে এই উক্তি তাঁকে কি জাতীয় রাজনীতিতে আলাদা জায়গা করে দেবে বলে তিনি মনে করছেন? শকুনের রাজনীতি তাঁর রাজ্যে হয়তো চলে, সারা রাজ্যের শিক্ষিত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা কি মেনে নেবেন এই কথা? তিনি যাঁদের সঙ্গে জোটে রয়েছেন, তাঁদের অনেকেই এই বক্তব্যকে পাশ কাটিয়ে গিয়েছেন। যেমন অজিত পাওয়ারের প্রবল প্রতিপক্ষ এবং বিজেপি বিরোধী, প্রাক্তন এনসিপি প্রধান শরদ পাওয়ার পর্যন্ত ভাইপোর এই মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। এমনকী কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে শুধুমাত্র তদন্ত হওয়া উচিত বলে বিষয়টিকে নিয়ে মন্তব্য করেছেন। সেখানে মুখ্যমন্ত্রী এহেন উক্তি বেশ অস্বস্তিতে ফেলেছে বিরোধী জোটকে। দিল্লির একটি সূত্র এটাও জানিয়েছে যে, পশ্চিমবঙ্গে আসন্ন বিধানসভা ভোটে মমতা ব্যানার্জির অবস্থান আলগা হয়ে যাওয়ার কারণে, নানা কথা বলে যে বিভ্রান্তির জাল বুনে চলেছেন, সে জালেই তিনি ধরাশায়ী হবেন বলে রাজধানীর রাজনীতির মহলে আলোচনা শুরু হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী যখন এহেন উক্তি করছেন, রাজ্যের রাজনৈতিক মহল আবার এক কদম এগিয়ে গিয়ে বলছে সাম্প্রতিককালে ঘটে যাওয়া নানা বিষয় নিয়ে কথা। গত ২৬ জানুয়ারি আনন্দপুরে ঘটে যাওয়া সাম্প্রতিক কালের সবচেয়ে ভয়াবহ আগুন লাগার ঘটনা, পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়া কুড়ির বেশি শ্রমিক, তামান্নাকে বোমা মেরে হত্যা, অভয়া ঘটনা সমেত বহু ঘটনার বিষয়কে সামনে আনছেন তাঁরা। তাঁদের বক্তব্য, মুখ্যমন্ত্রী দুর্ঘটনার বিষয়টিকে নিয়ে কথা বলার আগে ওইসব কথা ভাবা উচিত ছিল ডেকরেটরের ওই গোডাউনে আগুন লাগার পিছনে কি অন্য কোনো ঘটনা ছিল? তাহলে তিনি ঘটনা ঘটার পর পরই ওখানে গেলেন না কেন? অন্য রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকের অস্বাভাবিক মৃত্যু হলে, তাঁর দল কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে রাস্তায় মিছিল বের করে। এখন তাঁর রাজ্যে, তাঁর শহরে রুজির টানে আসা এতগুলো মানুষের জীবন্ত দগ্ধ হয়ে মৃত্যু ঘটল, তাঁর দলের এমন দায়সারা অবস্থান কেন? কেন এই শ্রমিকদের জন্য একটিও কথা তিনি খরচ করছেন না? কেন তাঁকে নানা অনিয়মের যুক্তি খুঁজতে হচ্ছে? কেন তার প্রশাসন একটা দায়সারা মনোভাব দেখাচ্ছে? কেন একটি মিছিল বেরল না শহরের রাস্তায়? তিনি কেন্দ্র বিরোধী রাজনীতি করুন, কিন্তু সেই রাজনীতি যেন গঠনমূলক হয়। ধ্বংসাত্মক যেন না হয়। ভোটের রাজনীতি করতে গিয়ে এমন নীতিহীনতা কেন? আপনার কি সাংবিধানিক আসনে বসে, এমনটি মানায়? আপনি ফাইল ছিনতাই করছেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারীদের হাত থেকে, আপনি প্রমাণ লোপাট করার জন্য ল্যাপটপ, মোবাইল সরিয়ে দিচ্ছেন। এটা কি আপনার মতো রাজনীতির খেলোয়াড়কে মানায়? একটু যদি লক্ষ্য করেন দেখবেন, আপনার ঘরের লোকই আপনাকে নিয়মিত অপদস্থ করছে। যেমন আপনি স্বাস্থ্যমন্ত্রী, স্বাস্থ্য দপ্তরকে বেআব্রু করে দিয়েছে আপনার যুবরাজ। সেবাশ্রয় আপনার মুখে একটা সপাটে কিছু কষিয়ে মেরে, সমান্তরাল স্বাস্থ্য ব্যবস্থা কায়েম করে, রাজ্য জুড়ে আপনার অকর্মণ্যতাকে প্রমাণ করে দিয়েছে। নিন্দুকেরা অবশ্য বলেছেন যে এখানেও সেই কাটমানির গল্প আছে। কেননা এখান থেকেই পাঠানো হচ্ছে যে সব হাসপাতালে, যেখানে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড ব্যবহার করা যায়। সেই কার্ডের বিলের ওপর একটা মোটা কমিশন যাচ্ছে কোথাও, কোনো একখানে। আবার ওই কার্ডের থেকে অনেক কিছুর সুবিধা না পাবার কারণে, গ্যাটের কড়ি খরচা করতে হচ্ছে গরিব মানুষদের।

আপনি কি মনে করেন, আপনি যা বলবেন, আর তা মানুষ তা বিশ্বাস করে নেবেন? আপনি ৯৯ শতাংশ মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে যে ভাবে মানুষকে বিভ্রান্ত করে চলেছেন, সেটা কি ঠিক করছে? মুখ্যমন্ত্রী হয়ে রাজ্যের মানুষের আশা, ভরসাকে আপনি অতল জলে ডুবিয়ে মেরেছিলেন, তা এখন সিঙ্গুরের মানুষ হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন। আবার আপনি সিঙ্গুর গেলেন। কই একবারের জন্য বললেন না নাতো ওখানে শিল্প ফিরিয়ে আনার কথা। বললেন নাতো কত মানুষ জমি ফেরত পেয়েছেন? কত মানুষ জমি ফেরত পেয়ে চাষ করছেন? হ্যাঁ, আপনি আবারও মিথ্যার আশ্রয় নিলেন। আপনি বললেন ওখানে দু'টি বড়ো ট্রেডিং হাউসের গোডাউন হবে। প্রধানমন্ত্রী আসার আগে তো আপনি বা আপনার মন্ত্রী ওখানের মানুষের কাছে এই বিষয়টি বলেননি। তাহলে কি আবার মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা? এমনটাই বলছেন অবহেলিত সিঙ্গুরের সাধারণ মানুষ। ফলে আবারো বলতে হচ্ছে, আপনি এই মিথ্যা ও বিভ্রান্তি তৈরির যে বিষয়টি নিয়ে খেলে চলেছে, সেই খেলা খেলতে খেলতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন না?

তবে এই খেলা এবার রাজ্যের মানুষ শেষ করে দেবেন ২০২৬-এ আপনি নিজেও জানেন, বিরোধী আসনে বসে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা চালিয়ে যাবেন, তবুও মানুষ শান্তি পাবেন এই ভেবে যে আপনাকে তাঁরা আর রাজ্য প্রশাসনের মাথা হিসেবে সহ্য করবেন না। □